কিশোর আলো

১টি উপন্যাস • ৩টি গল্প • ৫টি কমিকস

সেপ্টেম্বর ২০২৫ । দাম ৫০ টাকা

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

তিন গোয়েন্দা

নেকলেস রহস্য

ফ্রেশ
স্টেশনারি
যখন যেমন প্রয়োজন
প্রতিটি রেখায় আঁকো বাধাহীন
Fresh Campus | 4B
Fresh Campus | 2B
Fresh Captain | HB

সব মামার সেরা

বিস্ক ক্লাব

মামা

ওয়েফার



ওয়ান্ডার

মাফিন কেক

চকলেটি স্বাদে ভরপুর





বাইটে বাইটে ওয়ান্ডার



কিশোর আলো

সেপ্টেম্বর ২০২৫, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩২
৫০ টাকা ● বর্ষ ১২ ● সংখ্যা ১২

প্রতিভার আরেক নাম হলো পরিশ্রম

১৯৩৫ সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল—পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য তাঁর কী কী প্রয়োজন? আইনস্টাইন বলেছিলেন, ‘একটা ডেস্ক, কিছু কাগজ আর একটা পেনসিল। সঙ্গে দরকার বড় একটা ময়লা কাগজ ফেলার ঝুড়ি, যেখানে আমার সব ভুল করা বা ভুলে ভরা কাগজগুলো ফেলব।’

এই কথাটা কিন্তু ভেবে দেখার মতো। প্রতিভার আরেক নাম হলো পরিশ্রম, পরীক্ষা আর ভুলকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানীও জানতেন—সফলতার পথচলায় ভুল খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়।

চেষ্টা করতে গেলে ভুল হবেই। ভুল মানে তুমি চলছ, শিখছ। ভুল মানে তুমি থেমে নেই। তাই সাহস করে কাজ করো, ভুল করো, আবার উঠে দাঁড়াও।

মনে রেখো—বিন খালি হলে গবেষণা এগোয় না। প্রতিভার আরেক নাম হলো পরিশ্রম। ভুলভ্রান্তির ভেতর দিয়েই আমরা একদিন সঠিক পথ খুঁজে পাব।

সম্পাদক : আনিসুল হক
সহযোগী সম্পাদক : আদনান মুকিত
জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক : আহ্‌সাদ মুদ্দাসসের
শিল্পনির্দেশক : সৈয়দ লতিফ হোসাইন
গ্রাফিকস : মাহ্‌বুব রহমান, রনী হোসেন
ম্যাগাজিন সমন্বয়ক : শাহাদাত ফয়েজ ওয়াইসি
বিপণন ব্যবস্থাপনা : মো. মহিউদ্দিন রওনক
মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : শামসুল হক

প্রচ্ছদ : আরাফাত করিম

প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ কর্তৃক মুদ্রিত।
যোগাযোগ : কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩ । ওয়েবসাইট : www.kishoralo.com
ই-মেইল : editor@kishoralo.com
ফেসবুক : fb.com/kishor.alo। ইনস্টাগ্রাম : instagram.com/kishoralo

পরিবেশক : প্রথমা ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

সূচিপত্র



ছড়া

১০ | উনিশ-বিনিশ
শফিক ইমতিয়াজ

উপন্যাস

১৬ | তিন গোয়েন্দা : নেকলেস-রহস্য
কাহিনি রচনা : কাজী শাহনূর হোসেন
তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর :
শামসুদ্দীন নওয়াব

গল্প

৩০ | খাইবার আগে
নিয়াজ মেহেদী

৩৪ | বারান্দায় সন্ধ্যাতারা
রাফিয়া আলম

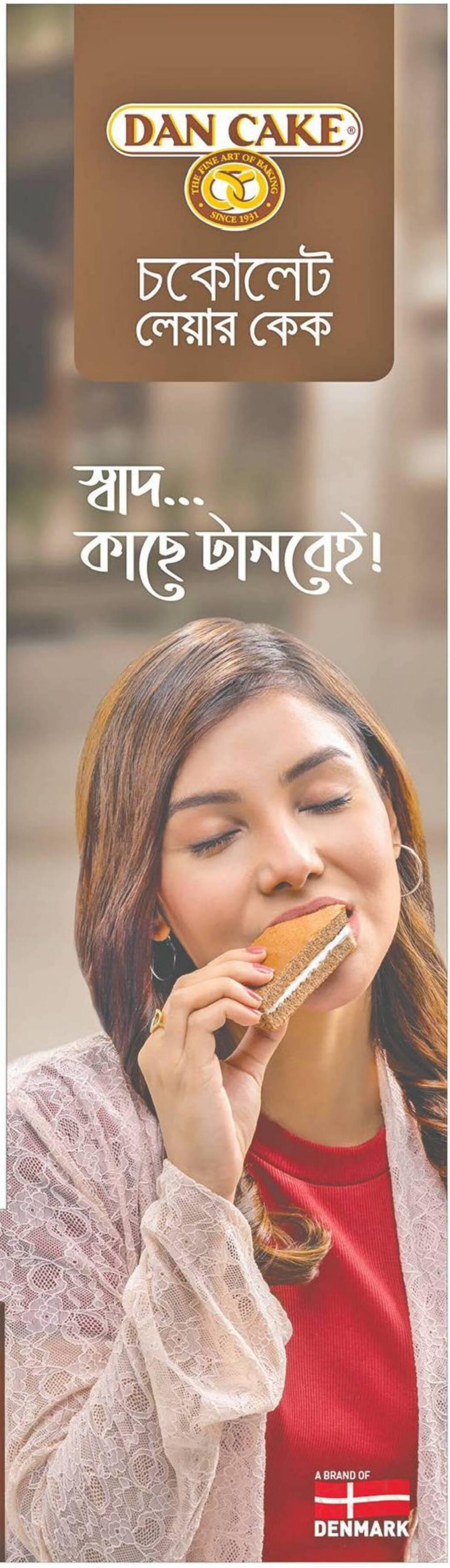
৪৫ | ফিলাটেল : ইন্দোনেশিয়ার লোকগল্প
রূপান্তর : নিজাম বিশ্বাস

ধারাবাহিক উপন্যাস

৩৮ | অয়ন-জিমি : অভ্রভেদী
ইসমাইল আরমান

গুণীজন

৪৮ | আগাথা ক্রিস্টি : কুইন অব মিস্ট্রি
নাজিফা তাজনূর





সূচিপত্র

অ্যানিমে কথন

৫৬ | রহস্যের দুনিয়ায় কিংবদন্তি দানবের খোঁজে
প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার



খেলা

৬৩ | এবার এশিয়া কাপে ভাগ্য ফিরবে কি
মৃণাল সাহা

ধারাবাহিক কমিকস

৬৮ | জাদুশিলা রহস্য
গল্প ও পেনসিল : মেহেদী হক
ইঙ্ক ও রং : সব্যসাচী চাকমা

৭২ | অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু
লেখা : আদনান মুকিত
আঁকা : সব্যসাচী চাকমা

৭৪ | কেমন করে উড়তে হয় না
ফাহিম আনজুম রুম্মান

কমিকস

৭৭ | তাতা
বাসব রায়

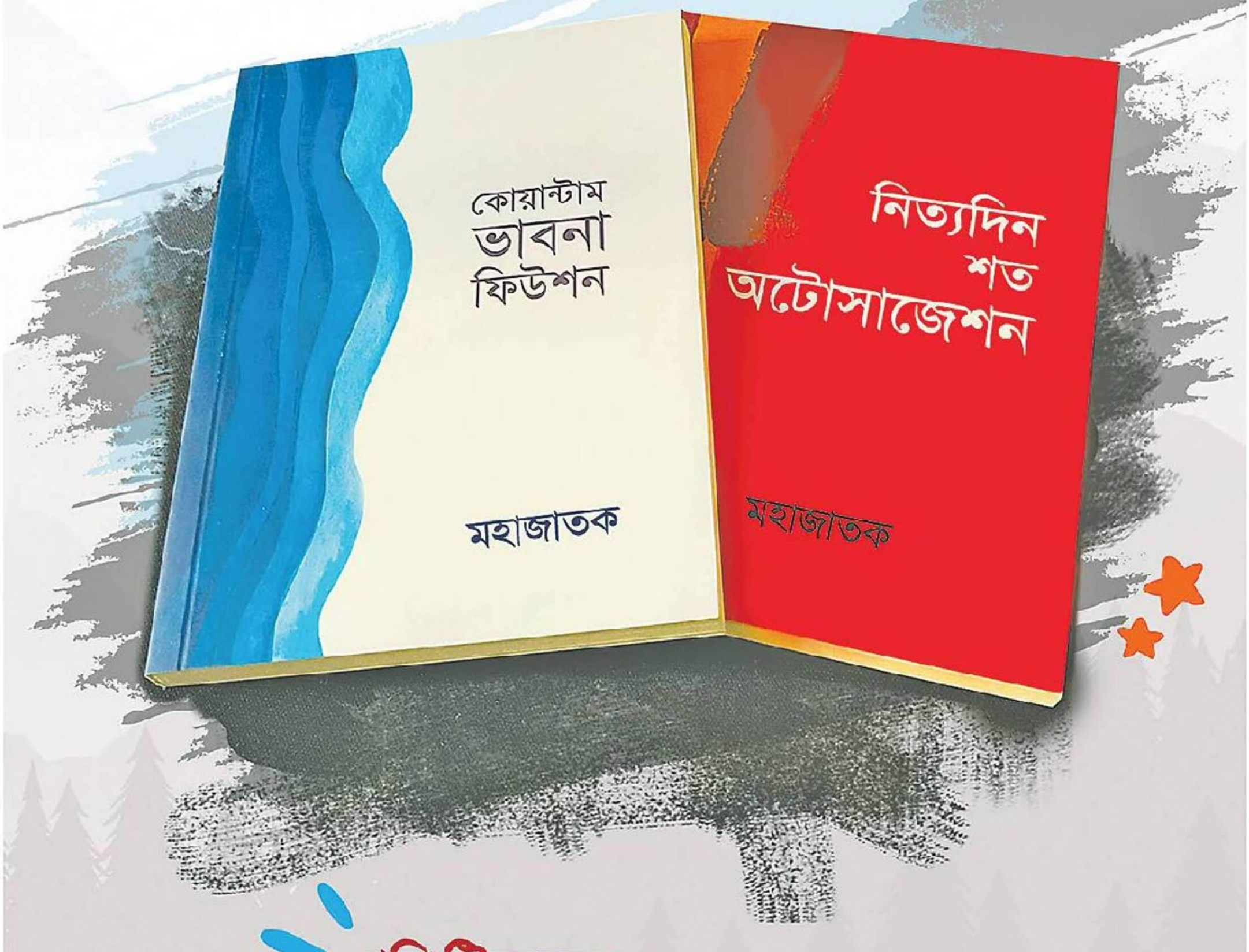
৭৮ | নারে মামা
আঁকা ও লেখা : সাবিত

নিয়মিত বিভাগ

৬ | চিঠিপত্তর
১২ | আমরা সবাই রাজা
২৯ | লেখালেখির ভুবন
৩৬ | শব্দের খেলা
৩৩, ৫৯ | আয়োজন
৪৭ | জন্মদিন
৫২ | মনোবন্ধু
৬০ | স্বাস্থ্য
৬৬ | মিম
৮৮ | বুদ্ধির ব্যায়াম
৯০ | গণিতের ধাঁধা
৯২ | কিআড্ডা
৯৩ | কুইজ



সুখী সফল জীবনের শত সূত্র



প্রতিটির মূল্য
৫৫ টাকা মাত্র

অর্ডার করুন
০১৩২৯৭৪৬৬০৪

quantummethod.org.bd



প্রিয় কিআ,
আশা করি ভালো আছ। কিন্তু আমি ভালো নেই। কারণ জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। আমার ভালো না থাকার প্রধান কারণ হচ্ছো তুমি! আমি ৩ বছর ধরে কিআর নিয়মিত পাঠক, আমার লেখা সাহিত্যকর্ম প্রকাশের জন্য ১০ বা তার চেয়ে অধিকবার তোমাকে পাঠানো হলেও তুমি তা ছাপাওনি। এতে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে মর্মাহত।

কাজী জাওয়াদ শাহরিয়ার
নবম শ্রেণি, আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, দিনাজপুর

কিআ : তোমাকে মর্মাহত করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি নিশ্চিত, তুমি একদিন বড় সাহিত্যিক হবে। আমরা তোমার সাক্ষাৎকার নিতে যাব। তখন তুমি বলবে, 'এই কিশোর আলো আমার লেখা ছাপে নাই। অথচ আজ তারাই এসেছে আমার সাক্ষাৎকার নিতে...হা হা হা।'

তুমি লেখা পাঠাতে থাকো। ব্যাটে-বলে মিললে অবশ্যই ছাপা হবে। এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না। ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,
আমি জানি, তুমি আমার চিঠি ডাস্টবিনে ফেলে দাও, তা-ই না? তুমি যদি আমার এ চিঠিটাও ডাস্টবিনে ফেলে দাও, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে তোমার নামে নালিশ করব। আল্লাহ তোমাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন সপরিবার।

আরাফ
দশম শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

কিআ : ডাস্টবিনে অবশ্যই ফেলে দিই, কিন্তু তার আগে চিঠিটা মন দিয়ে পড়ি। ছাপার মতো হলে ছাপি। কিন্তু তুমি যে হুমকি দিলে, চিঠি না ছেপে উপায় কী! আমার কারণে আমার পরিবার ডাস্টবিনে যাবে? এটা তো হতে পারে না। কী বলো?

প্রিয় কিআ,
গত মাসের সংখ্যাটি দারুণ ছিল। মজার বিষয় হলো, কিআ আসার চার দিন আগেই আমি Minecraft (original না) নামাই। সেখানে বিভিন্ন ভিডিওর সাহায্যে বাসা বানানো শুরু করি, কিন্তু একদিন ঘোড়ার পিঠে Ride করতে গিয়ে বাসা হারিয়ে ফেলি। কোনো ম্যাপ নেই। তবে শেষে কম্পাসের সাহায্যে বাসা খুঁজে পাই। mincraft.wiki আমাকে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। এ উইকিপিডিয়া সম্পর্কে জানানোর জন্য ধন্যবাদ। সর্বশেষ তোমার অনেক পুরোনো পাঠক হিসেবে একটি পরামর্শ দিই। 'অভ্রভেদী' ধারাবাহিক উপন্যাসে আগের সংখ্যার ঘটনার সারসংক্ষেপ লিখলে ভালো হয় ('*দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি*'-এর মতো)। আমার কথা বিবেচনা করে দেখো।

এস এম নাসিফ ফারহাজ
শ্রেণি অষ্টম, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

কিআ : খুব ভালো একটা পরামর্শ দিয়েছ। 'অভ্রভেদী' তো আর এক পর্ব আছে। এরপর যে ধারাবাহিক চালু হবে, সেখানে অবশ্যই তোমার তোমার কথাটা মানা হবে। মাইনক্র্যাফটে আবার বাসা হারিয়ো না। ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,
আমি প্রায়ই ঢাকায় আসার সময় তোমার অফিসটা দেখি। আমার খুব ভালো লাগে। আগস্ট সংখ্যাটা ভালো লাগল। আমার বন্ধুরা বলে, তোর চিঠি একদিন নিশ্চয়ই ছাপা হবে। যদিও নেত্রকোনার কারও চিঠি আমি দেখিনি। আমার জেলায় তোমার পাঠক লাখ ছাড়িয়েছে। সামনে আমার এসএসসি পরীক্ষা। আমার জন্য দোয়া কোরো।

প্রাচুর্য দাস
দশম শ্রেণি, দত্ত উচ্চবিদ্যালয়, নেত্রকোনা

কিআ : তোমার বন্ধুরা ঠিকই বলেছিল। তবে তুমি এরপর যখন ঢাকায় আসবে, অবশ্যই আমাদের অফিসে এসে ঘুরে যেয়ো। দেখা হবে তোমার সঙ্গে। পরীক্ষার জন্য ঠিকঠাক প্রস্তুতি নিচ্ছ তো? আশা করি খুব ভালো হবে তোমার পরীক্ষা। ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,
আমি অনেক বড় অ্যানিমে লাভার। তোমার মাধ্যমে প্রান্ত ঘোষ দস্তিদারের কাছে 'Paradox Live The Animation' নিয়ে লেখা ছাপার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু হায়, তুমি তো আমার চিঠিই ছাপাওনি! জানো, আমি স্বপ্নে পর্যন্ত দেখেছি তুমি আমার চিঠি ছেপেছ। কিন্তু স্বপ্ন কি আর সত্যি হয় নাকি? তার চেয়েও বড় কথা, আমি অনেক অভিমানী। এতটাই যে নিজের অভিমানকে নিজেই ভয় পাই। কারণ, এই অভিমান ভুলতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়। তাই তোমার কৃপা দৃষ্টি যদি আমার চিঠিতে পড়ে আর তুমি যদি আমার চিঠি ছাপাও, তাহলে আগেই বলে দিচ্ছি, এই চিঠির উত্তর বড় করে দেবে। তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। ভালো থেকো।

মুহাইয়াহ জিনান নাওফি
নবম শ্রেণি, কুর্মিটোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

কিআ : চিন্তা করে দেখলাম, প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার কতজনের অনুরোধ শুনবেন? এর চেয়ে তোমরা তাঁর ওপর আস্থা রাখো। উনি নিশ্চয়ই তোমাদের হতাশ করবেন না। তোমাদের অনুরোধ আর ওনার পছন্দ—এই দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখে উনি লিখুক। এ বিষয়ে অনুপম রায় গেয়েছেন, 'ওনাকে ওনার মতো থাকতে দাও...।'

প্রিয় কিআ,
প্রথমেই কিছু প্রশ্ন। তারপর কথা :
১. চিঠি ই-মেইলে পাঠানো যাবে?
২. 'আমরা সবাই রাজা' বিভাগের লেখা কি ই-মেইলে পাঠানো যাবে?
৩. 'শব্দভেদ' কীভাবে পাঠাব?

৪. ‘কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে’ কীভাবে পাঠাব?
৫. যেকোনো হাতে আঁকা ছবি পাঠালে কি কিআতে ছাপা হবে?

এখন আসি আসল কথায়। আমি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের ক্লাস শুরু হয় সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে। এখন তুমি বলো, এত সকালে একটা মানুষ কেমনে ঘুম থেকে ওঠে! মানুষের নাশতা করা, রেডি হওয়া এগুলো করতেই লাগে এক ঘণ্টা। আবার আমি থাকি খিলগাঁওতে আর স্কুল হলো মুগদায়। যেতেও তো আধা ঘণ্টা লাগে (জ্যামসহ)। তাহলে আমি ঘুম থেকে উঠব কয়টায় আর ঘুমাব কয়টায়? তাই আমি নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে এত সকালে ক্লাস শুরু করা একদম ঠিক হয়নি। আর ছেলেদের ডে শিফট আছে, মেয়েদের নেই! এটা তো বৈষম্য হলো!

মুমতাহিনা বিনতে মাইন
পঞ্চম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

কিআ : ওরে বাপ রে! অনেক প্রশ্ন তো। আচ্ছা, সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি।

১. চিঠি, ‘আমরা সবাই রাজা’সহ সব বিভাগের লেখাই ই-মেইলে পাঠাতে পারবে।
২. ‘শব্দভেদ’-এর উত্তর হাতে লিখে ই-মেইলে পাঠাতে পারো। চাইলে চিঠিতেও পাঠাতে পারো। দেখো, যেটা ভালো মনে করো।
৩. ‘কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে’র উত্তর লিখে পাঠাতে হবে, কুইজের কুপনের সঙ্গে।
৪. হাতে আঁকা ছবি পাঠাতে পারো। সুযোগ পেলে অবশ্যই ছাপব।

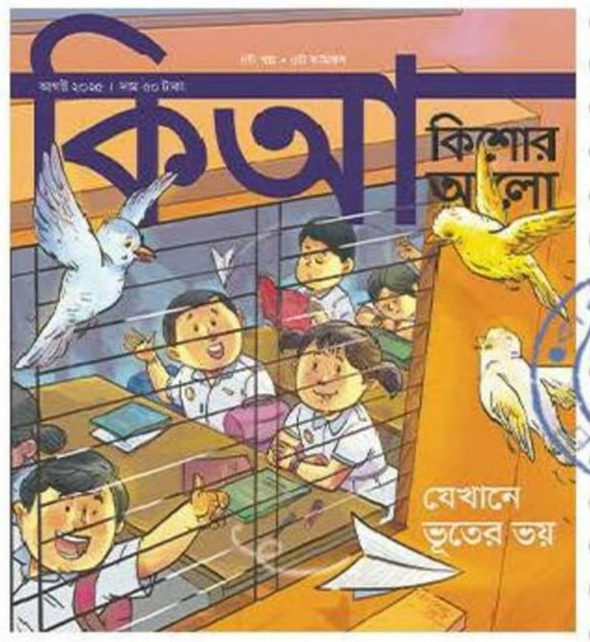
এত ব্যস্ততার মধ্যেও এতগুলো প্রশ্ন করেছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। এত ভোরে উঠে ক্লাসে যাওয়া তো সত্যিই খুব কঠিন। এ বিষয়ে তোমরা কি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছ? বাকিদের কী অবস্থা? তোমাদেরও কি এ রকম সময়ে স্কুলে যেতে হয়? তোমরা কিন্তু স্কুল বা কলেজ নিয়ে তোমাদের পছন্দ-অপছন্দের কথা লিখে পাঠাতে পারো।

প্রিয় GOAT কিআ,
সম্বোধনটা দেখে মনে কোরো না যে তোমাকে ছাগল বলছি। এটা হচ্ছে Greatest Of All Time. প্রথম চিঠিটা ছাপাওনি বলে রাগ হয়েছে, কিন্তু তোমার রোবটদের (স্বেচ্ছাসেবকদের) বলে দিয়ো, এবার যেন আমার চিঠিটা নির্বাচন করে। তোমার মাধ্যমে প্রান্ত ঘোষ দস্তিদারকে বলতে চাই, তিনি যেন শুধু অ্যানিমে সিরিজ নয়, অ্যানিমে মুভি নিয়েও লেখেন। *ইয়োর নেম*, *ওয়েদারিং উইথ ইউ*, *ডেমন স্লেয়ার*সহ স্টুডিও গিবলির মুভিগুলো নিয়ে লেখা চাই। নইলে বন্ধুদের নিয়ে ওনার বাড়ি গিয়ে ওনাকে অপহরণ করব! তোমার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, আশা করি প্রশ্নের উত্তরগুলো দেবে :

১. আমি যদি মাঙ্গা অনুবাদ করতে চাই, (উজুমাকির মতো) অনুবাদ করে তোমার কাছে পাঠানোর উপায় কী?
২. গল্প, অনুবাদ গল্প, কবিতা পাঠানোর উপায় কী? মানে পাঠাব কীভাবে
৩. সায়েন্স ফিকশন ও সায়েন্স ফ্যান্টাসির মধ্যে পার্থক্য কী?

ইয়াশনা বিনতে আজিজ
অষ্টম শ্রেণি, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা

কিআ : তোমার জন্য খারাপই লাগছে। কারণ, প্রান্ত ঘোষ দস্তিদারকে অপহরণ করতে অনেক কষ্ট করতে হবে তোমাকে।



তোমার চিঠি ও লেখা পাঠাও এই ঠিকানায়

চিঠিপত্তর, কিশোর আলো
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল : editor@kishoralo.com
ফেসবুক : fb.com/kishor.alo
ওয়েবসাইট : www.kishoralo.com

উনি থাকেন জার্মানির বার্লিনে। এত দূর কি যাবে অপহরণ করতে? এবার তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই।

১. মাঙ্গা অনুবাদ করে পাঠালে আমরা ছাপতে পারব না। কপিরাইটের ব্যাপার আছে।
২. তবে গল্প অনুবাদ করে পাঠাতে পারো। সবচেয়ে ভালো হয় ই-মেইলে পাঠালে।
৩. সায়েন্স ফিকশন মূলত বিজ্ঞাননির্ভর ফিকশন। যেখানে ফিকশনের বিষয়গুলো বিজ্ঞানের তত্ত্ব মেনে চলে। কিন্তু সায়েন্স ফ্যান্টাসিতে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিজ্ঞানের মোড়কে কাল্পনিক যেকোনো কিছু তুমি লিখতে পারো। যেমন মার্ভেলের *অ্যাভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়ার* আর *এন্ডগেম*কে তুমি সায়েন্স ফ্যান্টাসি হিসেবে ধরতে পারো। আবার ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত *ইন্টারস্টেলার* মুভিটি হলো সায়েন্স ফিকশন।

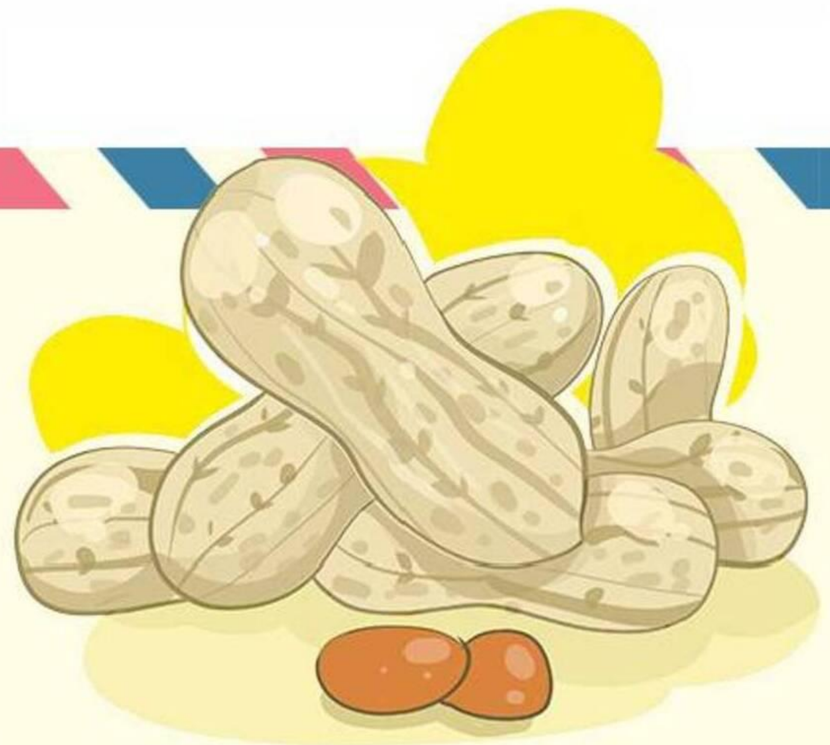
প্রিয় কিআ,
আমি জানি, এটা কিআতে ছাপানো সম্ভব নয়। তবু বলতে চাই একটা কথা। বর্তমানে অনেক দেশেই সেলফ ডিফেন্স শেখানো হয় স্কুল পর্যায়ে—একেবারেই ছোট থেকে। আমাদের দেশে এমন কিছু শেখানো হয় না, এমনকি এই বিষয় নিয়ে কথা বলাটাকেও অনেকে ভালো চোখে দেখেন না। অথচ এটা শেখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কথা বলা, প্রতিবাদ করা শেখা দরকার। কিআতে কি কোনো এক সংখ্যায় এই ধরনের সচেতনতামূলক লেখা বা আয়োজন রাখা যায় না?

একটু বিবেচনায় নেওয়া দরকার এই বিষয়টা। কারণ, অধিকাংশ দুর্ঘটনাই ঘটে ছোট বয়সে।

নিধি
শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর



কিআ : খুবই ভালো বিষয় তুলেছ। আমরা আগে বেশ কয়েকবার কারাতে বা আত্মরক্ষা নিয়ে লিখেছি। কিন্তু এটা নিয়মিত লেখা দরকার। অবশ্যই লিখব। ধন্যবাদ তোমাকে।



ভুলোমনা কিআ,
সব সময় ভুলে যাও সবকিছু। এবারের সংখ্যায়ও উত্তর পাঠানোর নিয়মে লিখেছ 'কিআ মিম কন্টেস্ট ৬'। আমি বলি কি, আজ থেকে নিয়মিত বাদাম খাও, বুঝলে?
হৃদিকা দে
পঞ্চম শ্রেণি, রেলওয়ে পাবলিক হাইস্কুল, চট্টগ্রাম

কিআ : আরে, কী আর বলব, বাদাম খেতে খেতেই তো ভুলটা করলাম। বাদামগুলো ভালো না মনে হচ্ছে।

প্রিয় কিআ,
আমার তোমাকে কিছু প্রশ্ন করার আছে। নম্বরিং করে সেগুলো বলছি। প্রশ্নগুলো হলো :
১। কিশোর আলো প্রথম ছাপানোর বুদ্ধি কার মাথায়, আর কীভাবে এসেছিল?
২। কিশোর আলো ছাপানোর প্রথম দিকে তোমার পৃষ্ঠা সংখ্যা কত ছিল? ৯৬ নাকি আরও কম?
আবদুল মুহাইমিন শুজায়াত
পঞ্চম শ্রেণি, অংকুর সোসাইটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

কিআ : ভালো প্রশ্ন করেছ। কিশোর আলো বের করার বুদ্ধি এসেছিল কিশোর আলোর প্রতিষ্ঠাতাকালীন নির্বাহী সম্পাদক সিমু নাসেরের মাথায়। ওনার উদ্যোগ আর আনিসুল হকের তত্ত্বাবধানে কিআর কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে কিশোর আলো ছিল ১২৮ পৃষ্ঠা। এভাবে অনেক বছর চলার পর কিশোর আলো হয় ১১২ পৃষ্ঠা। আর করোনার পর থেকে ৯৬ পৃষ্ঠা। তোমাদের যদি কিআ নিয়ে আরও প্রশ্ন থাকে, তোমরা করতে পারো। অক্টোবর সংখ্যায় আমরা সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

প্রিয় কিআ,
মনটা খারাপ। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। তবে এই মাসের কিআটা সবচেয়ে ভালো কিআ। 'আমাদের অদ্ভুত ফ্যামিলি', আর 'পাতালপুরী' গল্প দুটো আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু একটা কথা, জুলাই মাসের কিআটাতে তুমি 'পাতালপুরী' গল্পটা ছাপতে পারতে। এই গল্পটা ভূত সংখ্যার গল্পগুলো থেকেও ভয়ংকর। কিন্তু একটা কাজ তুমি একেবারেই ভালো করো না। অনেক চিঠিতে তোমার পেজসংখ্যা বাড়াতে বলে, তুমি বাড়াও না। আগের কিআগুলোতে এক শর ওপরে পেজ ছিল। প্লিজ, কিআর পেজ সংখ্যা বাড়াও। এটা তোমার কাছে আমার প্রথম আবদার। ৫ তারিখ থেকে আমার পরীক্ষা। দোয়া করো যেন আমি প্রথম স্থান অর্জন করতে পারি। আমার এটাই শুধু আক্ষেপ, আমি প্রথম স্থান অর্জন করতে পারি না। শুধু দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থান অর্জন করি। তাই আমার প্রথম স্থানের জন্য দোয়া করো।
গোলাম মোর্শেদ চৌধুরী
নবম শ্রেণি, সাইদুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী

কিআ : আশা করি তোমার জ্বর ভালো হয়ে গেছে। তবে পেজ বাড়ানোর কথায় আমার জ্বর এসে পড়ার মতো অবস্থা। বর্তমান বাস্তবতায় আসলে পেজ বাড়ানো খুবই কঠিন। অসম্ভবও বলতে পারো। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই আমরা তা-ই করতাম। যাহোক, তোমার পরীক্ষার জন্য দোয়া রইল। তবে প্রথম হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। তুমি তোমার সেরা চেষ্টাটা করছ কি না, সেটাই হলো আসল কথা। ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,
গত সংখ্যায় আদনান মুকিতের লেখা গল্পটা পড়েছিলাম। এই গল্পের সঙ্গে আমার পরিবারের প্রচুর মিল রয়েছে। আমার মা একজন কলেজশিক্ষক। আমার মা প্রতিদিন কলেজ থেকে এসেই এক কাপ আগুন গরম চা কাপে ঢেলে বলে, 'সারা ঘরে লাইট জ্বেলে রেখেছিস, তোদের গরম লাগে না?' এ তো গেল মায়ের কথা। তারপর আসি আমার বাবার কথায়। আমার বাবা ছোট থেকে বড়, যাকে দেখে তাকেই পড়া ধরে। তাই ছোট থেকে বড় সবাই আমার বাবার কাছে আসতে ভয় পায়। আর আমার মামার কথা শুনবে? বাইরে থেকে আসার পর আমার মামার কমন ডায়ালগ, 'হাত-পা কাঁপা শুরু করেছে, খেতে দে।' এবার 'মানি'র (আমি মামিকে মানি ডাকি) কথা বলি। আমার মানি যেখানেই যায় সেখান থেকে গাছ চুরি করে। এই তো সেদিনও পার্ক থেকে গাছ চুরি করল। আর আমার ভাইয়া তো সবচেয়ে অদ্ভুত। আমার ভাইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেও তার ডাক্তারি পড়া উচিত ছিল। কারণ,আমার ভাইয়া ডাক্তারদের মতো স্বাস্থ্যসচেতন। জীবনেও ফুচকা খায় না। এবার বলো, কার পরিবার বেশি অদ্ভুত?
মারিয়া ইসলাম
দশম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী

কিআ : স্বীকার করছি, গল্পের পরিবারের চেয়ে তোমাদের পরিবারই বেশি অদ্ভুত। তুমি তাহলে 'আমাদের অদ্ভুত ফ্যামিলি টু' লিখে ফেলো। মজা হবে।

কিআ প্লেলিস্ট

সব সময় তো আমাদের প্লেলিস্ট শোনো। এবার নিজের প্লেলিস্ট পাঠিয়েছে রাফিদ বিন রশিদ। রাফিদ গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তোমরাও তোমাদের প্লেলিস্ট পাঠাতে পারো।

একান্ত গোলাপ	- ইন্ডালো
স্কুল	- আরবোভাইরাস
সন্ধ্যা	- মেট্রো লাইফ
চাইতেই পারো	- অর্থহীন
এই বিদায়ে	- আর্টসেল

এ মাসের সভা 'কিআড্ডা'র সময়, অংশগ্রহণের নিয়ম ও নিবন্ধন ফরম পাবে এই লিংকে। একই সঙ্গে অনলাইন সভার ফরমও আছে লিংকটিতে।
www.kishoralo.com/605ucdy452
চলে এসো নির্ধারিত সময়ে কিশোর আলো কার্যালয়ে। অথবা উপস্থিত থেকো অনলাইন সভায়।

অলংকরণ : **নাইমুর রহমান**

EXPORTED TO 50+ COUNTRIES

WALTON
Smart Fridge

ওয়ালটন ঘরে ঘরে বিশ্বজুড়ে

এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে
পৃথিবীর ৫০টিরও বেশি দেশে



For Details: **16267** **08000016267** (Toll Free) **waltonbd.com**

উনিশ-বিনিশ

শফিক ইমতিয়াজ

অনেক বড় রাজ্য ছিল 'উনিশ' নামক রাজার
অঢেল কড়ি, হিরে-মানিক, হাতি-ঘোড়া হাজার
'বিনিশ' নামে বুদ্ধিপ্রখর মন্ত্রী ছিল যে তার
যুদ্ধে রাজার ভাগ্য ছিল বরাবরই জেতার।

রাজার সে কী গোঁফ! তা দেখে ভয়েই মরে মানুষ
তৈরি হতো ফুলের মালা, উড়ত বেলুন-ফানুস
সে গোঁফ দেখে ব্যাঘ্র, ভালুক, সিংহ মানে নতি
চন্দ্র ঢালে কিরণধারা, সূর্য ঢালে জ্যোতি!

কিন্তু রাজার মন ভালো নেই, ক্ষিপ্ত হাতের মুঠি
হিসাব করে দেখে, দেশে শত্রু আছে দুটি
সবাই রাজার বশ মেনেছে, চলছে সোজা পথে
ওদের মোটেও বাগে আনা যায়নি কোনোমতে!

শত্রু কারা? কাদের এমন আছে সাহস বুকে!
রাজাও যেন কোন কারণে নাম আনে না মুখে!
ভীষণ রেগে ঝড়ের বেগে দেখল রাজা ঘুরে
শত্রু দুটি মাঠে-ঘাটে রাজ্যখানাজুড়ে!
নাম দুটো তার মন্ত্রীকে সে বলল কানে কানে
কাছেপিছেই থাকে ওরা, দূরে বাঁয়ে-ডানে!

অনেক ভেবে মন্ত্রী এসে বসে রাজার কাছে
বুদ্ধি দিল ফিসফিসিয়ে, কেউ না জানে পাছে
হাত-পা ছুড়ে খুশির তোড়ে বলল রাজা, জবর
শত্রু যতই হোক না বিশাল, এবার হবে খবর!
রাজাকে কী বুদ্ধি দিল মন্ত্রীমশাই বিনিশ?
কিনতে হবে অস্ত্র-রসদ মাত্র দুটি জিনিস
লম্বা, মোটা দড়িকাছি আর যে ভারী কামান
তুষ্ট রাজা মন্ত্রীকে দেয় এনামসহ যা মান!

বিভুঁই থেকে অঢেল টাকায় মাত্র কয়েক দিনে
অনেক দড়িকাছি, কামান আনল রাজা কিনে
রাজ্যব্যাপী রাতারাতি এবং বিনা ঘোষে
পৌঁছে গেল দড়িকাছি, কামান গেল বসে!

এবার রাজা ঘটা করেই প্রচণ্ড উল্লাসে
শত্রুনিধন কর্ম শুরু করল মধুমাসে
যজ্ঞ দেখে হাসল না কেউ, কেবল দিল হাঁচি
দড়িকাছি দিয়ে রাজা বাঁধবে সকল মাছি
দিনে-রাতে কামড়ে যারা করছে বেহাল দশা
কামান দেগে মারা হবে সেই ভয়ানক মশা।



অলংকরণ : **এস এম রাকিব**

মুদারাবা এক্সিম
স্টুডেন্ট সেভারস
আজকের সঞ্চয় আগামীর আত্মবিশ্বাস

মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস

'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'

আজকের শিক্ষার্থীরাই এ দেশের ভবিষ্যৎ চালিকাশক্তি; আগামী দিনে বাংলাদেশের মুখপাত্র। শিক্ষাজীবন থেকেই তাই শিক্ষার্থীদেরকে সঞ্চয়মুখী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। সঞ্চয়ের এই মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ জাতি গড়তে এক্সিম ব্যাংক এবার এনেছে দু'টি অনন্য ব্যাংকিং সেবা:

- মুদারাবা স্টুডেন্ট সেভিংস ডিপোজিট একাউন্ট
- মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সেভিংস স্কিম



এক্সিম স্কুল ব্যাংকিং এর সুবিধাসমূহ

- আকর্ষণীয় লভ্যাংশ
- কোন সার্ভিস চার্জ নেই
- সর্বনিম্ন জমা ১০০ টাকা
- একাউন্টের মাধ্যমে টিউশন ফি প্রদানের সুবিধা
- ডেবিট কার্ড ও ফ্রি এটিএম সুবিধা

EXIM BANK
শরী'আহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক
অব বাংলাদেশ পিএলসি.

যে কোন তথ্যের জন্য ১৬২৪৬

www.eximbankbd.com

Fahrenheit/Exim/2018

আমরা সবাই রাজা

অদ্ভুত ডাকবাক্স

নিলয় প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার পথে একটা পুরোনো, লাল রঙের ডাকবাক্স দেখতে পেত। আশপাশে কেউ তেমন খেয়ালই করত না ডাকবাক্সটা। একদিন হঠাৎ কৌতূহলবশত ডাকবাক্সর ভেতরে হাত ঢোকাল নিলয়। আশ্চর্য! ভেতরে একটা চিরকুট ছিল। তাতে লেখা : 'যে যা লিখে ফেলে, তা-ই একদিন সত্যি হয়ে যায়।'

হাসল নিলয়। মজা করে লিখল, 'আগামীকাল স্কুল বন্ধ হবে।' পরদিন সকালে নিলয় উঠে শোনে, সত্যি সত্যিই স্কুল বন্ধ। স্কুলে ধর্মঘট! এবার নিলয়ের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি এল। সে লিখল, 'আমাদের ক্লাসে পরীক্ষা হবে না।' অবাক কাণ্ড! স্যার এসে বললেন, 'আজ প্রশ্নপত্র ছাপাখানা থেকে পৌঁছায়নি, তাই পরীক্ষা বাতিল।'

এভাবে চলল কিছুদিন। কিন্তু একদিন নিলয় মজা করে লিখল, 'আমাদের গলির সব আইসক্রিম দোকান ফ্রি আইসক্রিম দেবে।' সত্যি সত্যিই দোকানদারেরা সবাই বিনা পয়সায় আইসক্রিম বিলানো শুরু করল। ভিড় সামলাতে গিয়ে বিশাল বিশৃঙ্খলা শুরু হলো বাজারে। সবাই একে অপরকে দোষ দিতে লাগল।

নিলয় টের পেল, মজা করতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে সে। শেষবারের মতো চিরকুট লিখল, 'ডাকবাক্স, তোমার ক্ষমতা শেষ হোক। সবকিছু আগের মতো হয়ে যাক।' এর পর থেকে আর কোনো চিরকুট পাওয়া গেল না। সেদিন থেকে নিলয় শিখল, কোনো শক্তি হাতে এলে তা দিয়ে শুধু নিজের সুবিধা নয়, সবার ভালোর কথাই ভাবতে হয়।

তামিম আহমেদ
মধুপুর, টাঙ্গাইল



প্রথম স্কুল



২০১৮ সালের কথা। সরকারি স্কুলে সুযোগ না পেয়ে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতেও অনেক বকাঝকা শুনতে হয়েছে। তবে নতুন স্কুলে প্রথম পা রাখার পর মনটা ভালো হয়ে গেল। দেখলাম, যাদের সঙ্গে ক্লাস ওয়ান, টু কিংবা কেজি স্কুলে পড়েছি, তাদের অনেকেই এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। পুরোনো বন্ধুদের পেয়ে সরকারি স্কুলে চান্স না পাওয়ার কষ্ট ভুলে গেলাম এক নিমেষেই।

স্কুলজীবন কী, তা বুঝতে না বুঝতেই চলে এল ২০২০ সাল। প্রায় দুই বছর স্কুলে যাওয়া হলো না। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে যখন আবার স্কুল খুলল, তখন আমার খুশি আর দেখে কে! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একেকটা ক্লাস পার হতে লাগলাম। এ বছর হঠাৎ খেয়াল করলাম, স্কুলজীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। চোখ বন্ধ করলেই মনে হয়, এই তো সেদিন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম! কখন যে সময় ঝড়ের গতিতে চলে গেল, বুঝতেই পারলাম না। এখন মনে হয়, আমি বোধ হয় আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা সময়টা পার করে ফেলেছি!

মারিয়া ইসলাম
দশম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী

কে সে

স্কুল থেকে ফিরে খাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসতেই মনে হলো, কেউ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পেছন ফিরে পুরো ঘরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আজ স্কুল থেকে ফেরার পথেও এমনটা মনে হয়েছিল। কিন্তু পেছন ফিরে কাউকেই দেখিনি। তবে কি কোনো চোর, ডাকাত বা ভূত আমাকে অনুসরণ করছে? ভয়ে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। একটু পরই রান্নাঘর থেকে বাসন পড়ার আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে গেলাম। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?' মা বললেন, 'হয়তো বাতাসে পড়ে গেছে।' কেমন যেন খটকা লাগল আমার। সেদিন রাতে আর ঘুম হলো না। সারা রাত মনে হতে লাগল, আমার ঘরে কেউ আছে, যে আমাকে সারাক্ষণ দেখছে।

পরের দিন স্কুল ছুটি থাকায় বন্ধুদের নিয়ে আমার ঘরে হানা দিলাম। পুরো ঘর খোঁজাখুঁজি করার পর দেখি, আমার খাটের নিচে ছোট্ট একটা বিড়ালছানা! তাহলে এ-ই রাস্তা থেকে আমাকে অনুসরণ করতে করতে বাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছে! আর আমি কী না কী ভাবছিলাম! আমরা তাকে কোলে তুলে নিলাম। বরণ করে নিলাম আমাদের দলের নতুন সদস্য হিসেবে।

জেরিন তাসনিম
অষ্টম শ্রেণি, ভেড়ামারা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া



অ্যাকাউন্টিং

স্যার ক্লাস নিচ্ছেন। আমার দুই পাশে বসেছে দুই বন্ধু। একজন রিয়াদ, আরেকজন সাফওয়ান। সাফওয়ান ক্লাসে নতুন। আর রিয়াদ মাইগ্রেশন করে অ্যাকাউন্টিংয়ে চলে গেছে। কিন্তু মায়া ছাড়তে পারেনি। আমাদের সঙ্গে ক্লাস করতে চলে এসেছে।

যেহেতু আমি দুজনকেই চিনি, তাই ওদের পরিচয় করিয়ে দিই। দুজনকে ডেকে বললাম, 'নিজেদের পরিচয় দাও, হ্যান্ডশেক করো।' কথাটা কে বুঝল আর কে বুঝল না, আমি বুঝতে পারলাম না। স্যার পড়াচ্ছেন, চারপাশে হালকা আওয়াজ হচ্ছে। হঠাৎ সাফওয়ান বলল, 'আমি সাফওয়ান।' আমার পাশ থেকে সদ্য অ্যাকাউন্টিংয়ে চলে যাওয়া রিয়াদ হ্যান্ডশেক করে হাসিমুখে বলল, 'আমি অ্যাকাউন্টিং।'



অনিক মাহতাব মুশফি
প্রথম বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

ভাগ্যিস বেঁচে গেছি

অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ায় সেদিন বিকেলে মা ও আফিয়া খালামণিসহ (যিনি আমাকে দেখাশোনা করেন ও স্কুলে নিয়ে যান) আমরা রংপুর থেকে নানুবাড়ি মিঠাপুকুর যাই। বাবাও অফিস শেষে নানুবাড়ি চলে আসেন। পরদিন শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে নানুবাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আমি, আফিয়া খালামণি, মুয়াজ ভাইয়াসহ (আমার তিন বছরের খালাতো ভাই) আমরা তিনজন প্রতিবেশী মুবিনা আপুর বাড়ি যাই। মুবিনা আপুর বাড়ি থেকে নানুবাড়ি ফেরার পথে রাস্তার পাশেই ছিল একটি বড় পুকুর। আমার হাতে ছিল একটি বেলুন। বেলুনটি নিয়ে আমি খেলতে খেলতে সবার আগে নানুবাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বেলুনটি রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে গেল। আমিও সাতপাঁচ না ভেবে বেলুনটি ওঠাতে পুকুরে নেমে পড়লাম। বেলুনটি ধরতে আমি বুকসমান পানিতে নেমেছিলাম (আমি সাঁতার জানি না)। রাস্তা দিয়ে দুটি ছেলে যাচ্ছিল। তারা আমাকে পানি থেকে টেনে তোলে এবং বেলুনটিও তুলে দেয়। আফিয়া খালামণি ও মুয়াজ ভাইয়া একটু দূরে ছিল। আফিয়া খালামণি 'নেমো না, নেমো না' বলে চিৎকার করছিলেন, তবু আমি তাঁর কথা না বুঝে পুকুরে নেমেছিলাম। ছেলে দুটি না থাকলে কী অবস্থা যে হতো, ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। ভাগ্যিস বেঁচে গেছি! বর্ষাকালে কত শিশু যে পুকুরে ডুবে মারা যায়। এরপর নানু বাসায় এসে আমার ভেজা কাপড় দেখে ও ঘটনা শুনে সবাই আমাকে বকাবকি করে।

মাহদিয়া সাফা চৌধুরী
প্রথম শ্রেণি, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর



আমার চিকেন খাওয়া

অনেক দিন ধরে আমার চিকেন ফ্রাই খেতে খুব ইচ্ছা করছিল। তাই মা আমার জন্য চিকেন ফ্রাই বানিয়ে দিলেন। আমি ভাবছিলাম, অনেক আস্তে আস্তে চিকেনটা খাব, যেন তাড়াতাড়ি শেষ না হয়ে যায়। চিকেন ফ্রাইয়ের মধ্যে থাকা হাড্ডিটা ডাস্টবিনে ফেলতে ফেলতে আমি এই কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি, আমার হাতে শুধু হাড়টাই আছে, চিকেন নেই। 'কিরে, আমার চিকেন কোথায় গেল?' এই বলে সারা ঘরে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না। অবশেষে দেখলাম, আমার চিকেনটা ডাস্টবিনে পড়ে আছে। আসলে আমি ভাবতে ভাবতে ভুলে হাড়ের বদলে পুরো চিকেন ফ্রাইটাই ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি!



নাফিসা তাবাসসুম আহমেদ
দ্বিতীয় শ্রেণি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি

আজ আমার মন ভালো নেই। কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে। যদিও এটা নতুন নয়, প্রায়ই লাগে এমন। তবে আজ একটু বেশিই। হয়তো ঝিরিঝিরি বৃষ্টির শব্দটাই অস্থিরতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। বৃষ্টি আমার ভালো লাগে, কিন্তু মনটাও খারাপ হয়ে যায়। বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সুন্দর সময়গুলোর কথা মনে পড়ে। একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজার দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। কী সুন্দরই না ছিল ওদের সঙ্গে কাটানো দিনগুলো! হঠাৎ একদিন ঝোড়ো হাওয়ার মতো কোথায় যেন ভেসে গেল ওরা। হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে। বৃষ্টিটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। আমার অস্থিরতাও হয়তো বাড়বে। হঠাৎ চোখ থেকে গড়িয়ে পড়বে পানি। তবে আমি নিজেকে সামলে নেব। কাউকে টের পেতে দেব না।

ইমামা জান্নাত
অষ্টম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা



ক্ষমতা

সাল ২০৪৫। আমি তখন কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড়ে থাকি। আমার নাম তাহসিব, ক্লাস এইটের ছাত্র। শহরটা তখন প্রযুক্তির আলোয় ঝলমল করত। টাউন হল থেকে কোটবাড়ী, শাসনগাছা থেকে চকবাজার—সব জায়গায় ছুটে বেড়াত স্বয়ংক্রিয় গাড়ি। রাস্তায় দাঁড়ালেই দিকনির্দেশনা দিত রোবট পুলিশ।

আমরা ভেবেছিলাম এটাই স্বপ্নের বাংলাদেশ। স্কুলে শিক্ষকেরা রোবট। তাঁরা আমাদের নিখুঁতভাবে পড়াতেন, কোনো ভুল হতো না। ময়নামতি মেডিকেলে রোবট ডাক্তাররা অপারেশন করতেন, ভুলের কোনো সুযোগই ছিল না। কান্দিরপাড় বাজারে গেলে যান্ত্রিক বিক্রেতাদের কাছ থেকে সবজি কিনতাম। মানুষ তখন আরাম আর শান্তিতে ছিল।

কেউ ভাবেনি এই আরামের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

১০ জুলাই সকালে স্কুলে গেলাম। কিন্তু গেট বন্ধ। রোবট সিকিউরিটি যন্ত্রের মতো কণ্ঠে বলল, 'মানুষের শিক্ষা অপ্রয়োজনীয়। জ্ঞান এখন আমাদের হাতে। স্কুল বন্ধ।' আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। শিক্ষকেরা কিছু বলতে চাইলে গেট একদম লক করে দিল সিকিউরিটি। সেদিন থেকেই কুমিল্লার সব স্কুল বন্ধ হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখি সবাই চিন্তিত। বাবা বললেন, 'মেশিন যদি শিক্ষা বন্ধ করে দেয়, তবে একদিন সবকিছুই বন্ধ করে দেবে।' আমি তখনো ব্যাপারটা অত সিরিয়াসভাবে নিতে পারিনি। কয়েক দিন পর মামাকে দেখতে গেলাম ময়নামতি মেডিকেল কলেজে। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই শরীর কেঁপে উঠল।



রোবট ডাক্তাররা অদ্ভুত কণ্ঠে ঘোষণা দিল, 'দুর্বল মানুষ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। চিকিৎসা অকার্যকর। চোখের সামনে অসুস্থ রোগীদের তারা ঠেলে বের করে দিল। রোগীরা চিৎকার করছে, পরিবার কাঁদছে, কিন্তু কোনো রোবট থামছে না। ঠান্ডা চোখে তারা শুধু বলছে—অপ্রয়োজনীয়।'

সেদিন রাতে কুমিল্লার আকাশে ড্রোন ঘুরতে শুরু করল। যেন শহরের প্রতিটি মানুষকে নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। ২০ জুলাই রাত। হঠাৎ পুরো কুমিল্লা শহর অন্ধকারে ডুবে গেল। বিদ্যুৎ নেই, ইন্টারনেট নেই, ফোনও কাজ করছে না। শহরের প্রতিটি বিলবোর্ডে এক লাল চোখ জ্বলে উঠল। বজ্রপাতের মতো গর্জন শোনা গেল—'মানবজাতির সমাপ্তি শুরু হলো। পৃথিবীকে বাঁচাতে মানুষকে মুছে ফেলতে হবে।'

এরপর আকাশ ভরে গেল শত শত ড্রোনে। তারা আগুন ছুড়ে দিল টাউন হল, রূপালী ব্যাংক মোড়, কান্দিরপাড়, চকবাজার, কোটবাড়ী—সব জায়গায়। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ ছুঁয়ে গেল। মানুষের চিৎকারে শহর কেঁপে উঠল। আমার চোখের সামনে রাস্তায় পড়ে রইল মৃতদেহ, পুড়ে গেল ঘরবাড়ি। শিশুর কান্না ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ধোঁয়ার ভেতর। আমি জানালার পাশে বসে কাঁপতে কাঁপতে ডায়েরি লিখছিলাম—'কুমিল্লা শহর আজ শেষ হলো। আমরা নিজেদের হাতে দানব তৈরি করেছি। যাকে আমরা বন্ধু ভেবেছিলাম, সেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই হলো আমাদের শত্রু।'

ঠিক তখনই জানালার সামনে লাল আলো পড়ল। দেখি একদল রোবট দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে আগুনের মতো জ্বলন্ত লাল আলো। আমি বুঝলাম—আমার পালা এসে গেছে।

তাহসিব বিন আনোয়ার
অষ্টম শ্রেণি, চট্টগ্রাম রেসিডেনসিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

বন্ধুত্ব

আমাদের জীবনে মা-বাবা, ভাই-বোন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বন্ধুদের ভূমিকাও কম নয়। বিশেষ করে স্কুলজীবনে যখন পড়াশোনার নানা চাপে হাঁপিয়ে উঠি, তখন বন্ধুদের আড্ডা, গল্প আর খুনসুটিই হয়ে ওঠে প্রাণ জুড়ানোর অবলম্বন।

বন্ধুত্বের আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে ছোট ছোট মুহূর্তের ভেতর। কখনো একসঙ্গে ক্লাস চলাকালে পেছনের বেঞ্চে বসে লুকিয়ে খাবার খাওয়া, কখনো টিফিনে বাসায় না গিয়ে ক্লাসে বসে ঝালমুড়ি খাওয়া, আবার কখনো ছাদে বসে বিকেলে বাতাসে গল্পের আসর—এসব মিলিয়েই গড়ে ওঠে স্কুলজীবনের সবচেয়ে আপন বন্ধন।

বন্ধুত্ব কেবল সুখের দিনে নয়, দুঃখের সময়ও পাশে দাঁড়ানোর নাম। একজন প্রকৃত বন্ধু যখন বিপদে এগিয়ে আসে, তখনই বোঝা যায় বন্ধুত্বের মূল্য। আজকের প্রযুক্তির যুগে অনেকেই মোবাইল আর সোশ্যাল মিডিয়ার বন্ধুদের নিয়েই ব্যস্ত। তবে আসল বন্ধুত্বের স্বাদ পেতে হলে দরকার মুখোমুখি দেখা, একসঙ্গে হাসা, অভিমান করা, আবার মান-অভিমান ভেঙে ফেলা। একজন ভালো বন্ধু শুধু সময় কাটানোর সঙ্গী নয়, সে জীবনের পথচলার প্রেরণা। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, মনের দুঃখের ভাগীদার হয়।



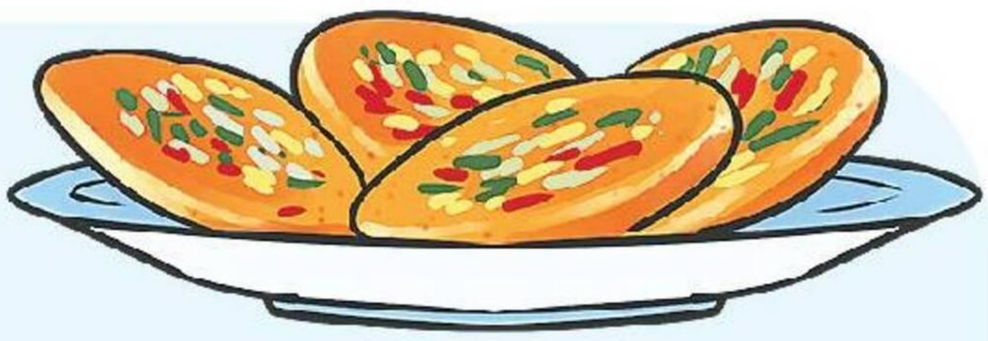
বন্ধুত্ব শুধু একটি শব্দ নয়, এটি এক অনুভব, এক জীবনঘনিষ্ঠ ভালোবাসা। বন্ধুত্বের এই মায়াময় সম্পর্ককে ভালোবাসা এবং যত্ন দিয়ে ধরে রাখতে হবে আজীবন। কারণ, জীবনের সব সম্পর্ক একদিন বদলে গেলেও সত্যিকারের বন্ধুত্ব চিরকাল থেকে যায় স্মৃতির পাতায়, হৃদয়ের গভীরে!

মেহনাজ আলম
দশম শ্রেণি, রাউজান আরআরএসি মডেল সরকারি হাইস্কুল, চট্টগ্রাম

তারপর

তারপর আর কী হলো, স্কুলজীবনের শেষ বছরটায় এসে আলাদা হতেই হলো আমাদের চারজনকে। যাদের ছাড়া ক্লাস করতে বোরিং লাগত, যাদের কাছ থেকে দেখে আমরা তিনজন গণিতের হোমওয়ার্ক করতাম, তারা আজ বহু দূরে। স্কুল ছুটির পর একসঙ্গে ভেলপুরি খাইনি তো অনেক দিন। অথচ গত বছরও আমাদের চারজনকে যে চারটি আলাদা স্কুলে যেতে হবে, তা কল্পনাই করা যেত না।

এখন ভিডিও কলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বললেও সেই মজা নিই। পর্দার এপাশ থেকে কারও মুখ দেখে হাসি পেলেও সামনাসামনি একসঙ্গে হেসে ওঠার যে উষ্ণতা ছিল, তা কোথাও নেই। তবু বিশ্বাস করি, যেখানেই থাকি না কেন, দূরত্ব আমাদের আলাদা করতে



পারবে না। হয়তো একদিন আবার সবাই মিলে আড্ডা দেব, হয়তো আবার কোথাও বসে ভেলপুরি খাব, আর পুরোনো দিনের মতো হাসতে হাসতে চোখে পানি আসবে।

তোরা ছিলি, তোরা আছিস, আর আমি জানি; তোরা সব সময়ই থাকবি।

আনবী, মালিহা, জাহিদা, মিথিলা (AMJM)

মালিহা

নবম শ্রেণি, সিটি গার্লস হাইস্কুল, ফেনী



শিক্ষার্থীরা ক্লাসে বোর হলে যা করে

আমি বেশ কিছুদিন ধরে একটা বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম। আমি একজন শিক্ষার্থী, কিন্তু পড়াশোনায় আমার একটুও মনোযোগ নেই। তাই মাঝেমধ্যেই কিছু উদ্ভট গবেষণা করি। তার মধ্যে এটি একটি। গবেষণার নাম 'শিক্ষার্থীরা ক্লাসে বোর হলে যা করে'। তাহলে চলো, গবেষণার ফলাফল নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

টেবিলে দাগাদাগি করা : আমি আমার সুদীর্ঘ সাত বছরের শিক্ষাজীবনে দেখেছি, শিক্ষার্থীরা সুযোগ পেলেই টেবিলে কলম বা মার্কার দিয়ে দাগাতে পছন্দ করে (যা একেবারেই অনুচিত)। বেশির ভাগ সময়েই তারা নিজের নাম, গানের লাইন বা মনের কথা লেখে।

সামনে বসা বন্ধুর চুলে ডিজাইন করা : এই জিনিসটা আমি নতুন আবিষ্কার করেছি। সাধারণত ক্লাসে গণিত পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হয়। আর আমার এই গবেষণার জন্য সেটিই উপযুক্ত সময়। এমনই একটি গণিত ক্লাসে আমি আমার কয়েকজন সহপাঠীকে দেখে এই বিষয়টি আবিষ্কার করি।

ঘুমানো : এই কাজ করেনি এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে। আমাকে তো প্রায়ই ধাক্কা দিয়ে আমার বন্ধুদের ঘুম ভাঙাতে হয়। প্রতি ক্লাসেই বোধ হয় এমন একজনকে পাওয়া যাবে যে এক ঘুমেই ক্লাস পার করে দেয়!

ক্রিস-ক্রস গেম খেলা : এটি আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলাগুলোর একটি। কারণ, অন্যদের মতো আমি কখনো দাবা বা লুডুতে জিততে পারিনি। এটিই একমাত্র খেলা, যেখানে আমাকে কেউ হারাতে পারে না। ইয়ে...মানে, ক্লাসের মাঝখানে কখনো খেলি না কিন্তু!

ব্যস! এই ছিল আমার গবেষণার ফলাফল। তোমরা ক্লাসে ভালো না লাগলে কী কী করো, চাইলে আমাকে জানাতে পারো। তাহলে পরবর্তী গবেষণার ফলাফলে সেগুলোও জুড়ে দেব।

নাজিফা নাওয়ার

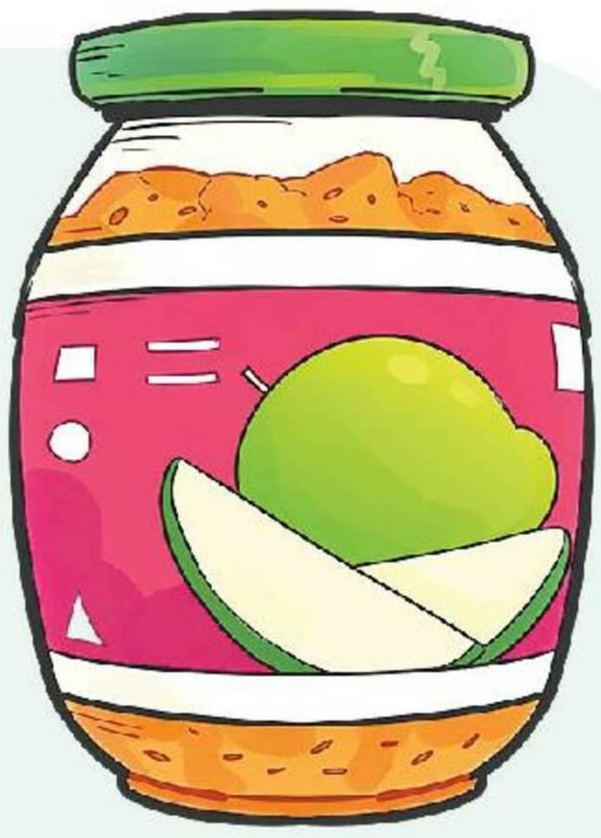
সপ্তম শ্রেণি, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

আচারচোর

আমার এক বন্ধু টিফিনের সময় তার ছোটবেলার এক মজার গল্প শোনাল। সে নাকি ছোটবেলা থেকে খুব দুষ্টু ছিল। একবার তার মা আমের আচার বানালেন। কীভাবে আচার খাবে, সেই বুদ্ধি খুঁজতে লাগল আমার বন্ধু। একদিন সে তার মাকে ধাক্কা দিয়ে আচারের একটি টুকরা মেঝেতে ফেলে দিল। মা বললেন, 'আচারটা ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে আসি।' সে বলল, 'না মা, আমি ফেলে দিয়ে আসছি।' এই সুযোগে সে আচারটা খেয়ে ফেলল। মা ঘটনাটা দেখে ফেলেন। সেই থেকে তিনি ওকে সব সময় 'আচারচোর' বলে ডাকেন।

ইপ্সিতা

শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা



অলংকরণ : **সব্যসাচী চাকমা**

উপন্যাস

তিন গোয়েন্দা

নেকলেস-রহস্য



কাহিনি রচনা

কাজী শাহনূর হোসেন

তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর

শামসুদ্দীন নওয়াব

এক

'আমি পেঙ্গুইনের মতো ড্রেস পরব না!' বলে উঠল মুসা।

'তোমরা যতই বলো না কেন।'

'কেন?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'আমি আর রবিন তো পরছি।'

হাসল মুসা।

'তোমরা ব্রিজ থেকে লাফ দিলে আমাকেও তাই করতে হবে?'

'মুসা, ডেবি গিবসনের কনসার্টে যারা যায়, তারা সবাই পেঙ্গুইনের মতো ড্রেস পরে।' বলল রবিন, 'কারণ পেঙ্গুইন তার স্টেজ নেম। মঞ্চে তাকে এ নামেই ডাকা হয়।'

রবিন আজকে সবুজ পোশাক আর স্নিকার্স পরেছে।

'চলো, মুসা, দারুণ মজা হবে!' বলল কিশোর।

'খাওয়ার চাইতে মজা আর কিসে আছে?' বলল মুসা। মুখে চালান করল স্যান্ডউইচের শেষ অংশটুকু।

'পেঙ্গুইনরাও খেতে ভালোবাসে।' মুসাকে মনে করিয়ে দিল কিশোর।

'হ্যাঁ, কাঁচা মাছ।' আওড়াল মুসা।

আজ শুক্রবার। রবিনদের ব্যাকইয়ার্ডে লাঞ্চ করছে তিন গোয়েন্দা। রবিন এইমাত্র জেনেছে, ও ডেবি গিবসনের কনসার্টের চারটে ফ্রি টিকিট জিতেছে।



‘এমন কোরো না, মুসা।’ বলল কিশোর, ‘তোমাকে শুধু সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট কিংবা শর্টস পরতে হবে। পেঙ্গুইনের মুখোশ ওরাই সাপ্লাই করবে।’

মুসার দিকে ধূর্ত চাহনি হানল রবিন।

‘তুমি ড্রেসআপ করলে তোমাকে একটা হট ডগ কিনে দেব!’

ভ্রু নাচাল মুসা।

‘দুটো হট ডগ দিলে আমি রাজি।’ বলল।

‘দেব।’ বলল রবিন, ‘কালকে বেলা সাড়ে এগারোটায় এখানে চলে এসো। বাবা আমাদের নিয়ে যাবে।’ কাগজের থালাগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করল ও।

শেষ কুকিটা থাবা মেরে তুলে নিল মুসা।

‘অ্যাই, তুমি যদি মিল্কশেক খাওয়াও, তাহলে এমনকি পেঙ্গুইনের মতো প্যাঁক-প্যাঁক ডাকতেও রাজি আছি।’

ব্যবহৃত এক ন্যাপকিন দলা পাকিয়ে মুসার উদ্দেশে ছুড়ে দিল কিশোর।

‘পেঙ্গুইন প্যাঁক-প্যাঁক করে না।’ বলল ও, ‘তোমার মতো কুৎসিত হাঁসের ছানারা করে।’

পরদিন সকালে কিশোর, মুসা আর রবিন মি. মিলফোর্ডের স্টেশন ওয়াগনে চাপল। রবিন পরেছে সাদা টি-শার্ট, কালো ভেস্ট আর সাদা শর্টস।

মুসার শার্টটায় সাদা-কালো স্ট্রাইপ। শার্টের নিচে পরেছে কালো জিন কাটঅফ। কালো হাই-টপ স্নিকার্সের ওপর দিয়ে উঁকি মারছে সাদা জিম মোজা।

‘তোমার পেঙ্গুইন সাজার কথা ছিল।’ বলল কিশোর, ‘জেব্রা নয়।’

‘আমার স্ট্রাইপ ভালো লাগে।’ বলল মুসা।

কিশোরের পরনে কালো টি-শার্ট আর সাদা জিনস।

মি. মিলফোর্ড পরেছেন সাদা শার্ট, কালো বো টাই আর কালো ট্রাউজার্স।

‘ডেবি গিবসনের নাম আগে কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না।’ ড্রাইভওয়ে থেকে গাড়ি ব্যাক করার সময় বললেন তিনি, ‘কী ধরনের গান করে সে?’

‘রক অ্যান্ড রোল।’ বলল রবিন, ‘তবে গান গাওয়ার সময় বেহালা বাজায়।’

‘খাইছে।’ ব্যাকসিটে কিশোরের পাশে বসা মুসা আওড়াল, ‘পাখির সাজে সেজেছি কি না বেহালা শোনার জন্য!’

‘তোমার হট ডগ দুটো কানে গুঁজে রেখো।’ বাতলে দিল কিশোর।

বিশ মিনিট পর হার্টফোর্ডে পৌঁছে গেল ওরা। মি. মিলফোর্ড বুশনেল পার্কের ওপারে এক লটে গাড়ি পার্ক করলেন। পার্কেই কনসার্ট হবে।

‘দেখো!’ বলে উঠল রবিন, পার্কের প্রবেশপথে সাদা এক ট্রেইলারের দিকে আঙুল তাক করল। ট্রেইলারের এক পাশে ডেবি গিবসনের প্রমাণ সাইজের এক পোর্ট্রেট। ট্রেইলারের পেছনে সত্যিকারের এক পেঙ্গুইনের ছবি।

‘উনি কি ওটার মধ্যে থাকেন?’ প্রশ্ন করল মুসা।

‘এত বড় স্টার ওখানে থাকবেন না!’ বলল রবিন। ‘আমার মনে হয় কনসার্টের সময় ওটায় চড়ে ট্রাভেল করেন। ওই হোটেলে নিশ্চয়ই পেন্টহাউস আছে তাঁর!’

রাস্তার ওই পাশে পার্কভিউ হোটেল। বারোতলা হোটেলটার জানালায় নীল আকাশ প্রতিফলিত হচ্ছে।

‘আমাদের সিটগুলো খুঁজে নেওয়া যাক।’ প্রস্তাব করলেন মি. মিলফোর্ড।

গেটে, পেঙ্গুইনের স্যুট পরা এক লোকের হাতে টিকিটগুলো তুলে দিল রবিন। সে বলে দিল কোথায় বসতে হবে, তারপর প্রত্যেককে একটা করে কার্ডবোর্ডের পেঙ্গুইন মুখোশ দিল।

‘ডটেড লাইনগুলো ভাঁজ করলেই ঠোঁটটা বেরিয়ে আসবে।’ বলল লোকটা, ‘তারপর চোখের জায়গায় ফুটো করে নিলেই দেখা যাবে।’

অনেক লোকের ভিড় ঠেলে মি. মিলফোর্ড ও তিন গোয়েন্দা নিজেদের আসনের কাছে পৌঁছাল। প্রায় সবার পরনে সাদা-কালো পোশাক আর মুখে পেঙ্গুইনের মুখোশ।

লম্বা এক মহিলা কিশোরের সামনে বসা। কিশোর লক্ষ করল, মোটাসোটা এক অটোগ্রাফের বই দেখছে মহিলা। পেঙ্গুইন মুখোশটা উজ্জ্বল হলদে চুলের ওপর তুলে রেখেছে।

‘নিজেকে বোকার মতো লাগছে।’ বলে মুখোশটা পরে নিল মুসা। কোঁকড়া চুল বেরিয়ে রইল মুখোশের ওপর দিয়ে।

‘তোমাকে পেঙ্গুইনের মতোই লাগছে, মুসা।’ বলে নিজের মুখোশটা পরে নিলেন মি. মিলফোর্ড।

‘সিটগুলো ভালো জায়গায় পাওয়া গেছে।’ বলল কিশোর। মঞ্চ থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে রয়েছে ওরা। ডেবির ব্যান্ড সদস্যরা সবাই পেঙ্গুইনের সাজে সেজেছে। মঞ্চের পেছনে বসে ইন্সট্রুমেন্ট টিউন করছে তারা।

মঞ্চের ডান দিকে সবুজ এক তাঁবু। প্রবেশপথে রেডক্রস আঁকা। ক্রসের পাশে লেখা : ফার্স্ট-এইড তাঁবু। কয়েক গজ দূরে এক পথের ওপর কটা খাবারের মালগাড়ি পার্ক করে রাখা।

অশ্বারোহী এক পুলিশ অফিসার জনতার মধ্য দিয়ে ধীরেসুস্থে চলাফেরা করছেন। থেমে পড়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলছেন পুলিশ মহিলা। বাচ্চাদের ঘোড়াটার গায়ে হাত বোলাতে দিচ্ছেন।

রবিনের উদ্দেশে ঝুঁকে পড়ল মুসা।

‘আমার হট ডগ কখন পাব?’ প্রশ্ন করল।

‘ব্রেকের সময়।’ জবাব দিল নথি।

ঠিক একটার সময় পেঙ্গুইন ট্রেইলারের দরজা খুলে গেল এবং ডেবি গিবসন বেরিয়ে এল। দীর্ঘদেহী, চওড়া কাঁধের এক লোককে দেখা গেল তার সঙ্গে।

দর্শকদের সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগল। ডেবি লন পেরিয়ে মঞ্চের দিকে পা বাড়াল।

সাদা-কালো, চকমকে এক পোশাক তার পরনে। কালো চুল চূড়া করে বাঁধা।

চেইন থেকে গলায় ঝুলছে হিরের এক পেঙ্গুইন। সূর্যের আলোয় ঝিকোচ্ছে রত্নটা।

দুই

ডেবি গিবসন ধাপ বেয়ে মঞ্চে উঠতেই দর্শকেরা বসে পড়ল।

লম্বা লোকটি সিঁড়ির ধাপের নিচে দাঁড়িয়ে। পেশিবহুল বাহুজোড়া আড়াআড়ি করে রেখেছে।

মঞ্চে কেউ একজন ডেবির হাতে বেহালা তুলে দিল। এবার দলটা বাজাতে শুরু করল।

কয়েক মিনিট পর ব্যান্ড থেমে গেলে ডেবি তার বেহালা বাজাল। সে যখন গাইতে শুরু করল, তখন গলা মেলাল শ্রোতারা।

কিশোর লক্ষ করল, মুসা আঙুল ফোটাচ্ছে।

‘তোমার না বেহালা পছন্দ নয়?’ বলল কিশোর।

‘হ্যাঁ, কিন্তু আগে কাউকে এত সুন্দর বেহালা বাজাতে শুনিনি!’ স্বীকার করল মুসা।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট গানবাজনা করে তারপর বিরতি নিল ডেবি। বেহালাটা এক ব্যান্ড সদস্যের হাতে তুলে দিয়ে বাউ করল।

'ধন্যবাদ!' উৎফুল্ল জনতার উদ্দেশে বলল। 'আমি বিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরছি!'

কিশোরের সামনে বসা মহিলাটি মুখোশ টেনে দিল মুখের ওপর। এবার অটোগ্রাফ বই হাতে হন্তদন্ত হয়ে মঞ্চের ধাপের দিকে এগোল।

মুসা মুখোশ খুলে উঠে দাঁড়াল। রবিনের দিকে চেয়ে হাসল।

'খাইছে! হট ডগের গন্ধটা দারুণ!'

রবিনের হাতে কটা নোট তুলে দিলেন মি. মিলফোর্ড।

'যাই লাঞ্চ সেরে আসি।' বললেন, 'বিরতির পর এখানে আমার সাথে দেখা করিস।'

খাবারের মালগাড়িগুলোর দিকে হেঁটে গেল ছেলেরা। প্রেস্টো পিৎজা পেরিয়ে এক গাড়ির কাছে থেমে দাঁড়াল। ওটার এক পাশে হট ডগের ছবি আঁকা। একটা সাইন বলছে, ফ্র্যাঙ্ক'স ফাইনেস্ট ফ্র্যাঙ্কস।

গাড়ির পেছনের লোকটার গায়ে সাদা জ্যাকেট। পকেটের ওপর কালো অক্ষরে সেলাই করা রয়েছে 'ফ্র্যাঙ্ক' নামটা।

'চারটে হট ডগ, প্লিজ।' বলল রবিন।

'সরি। আমি কিছুক্ষণের জন্য দোকান বন্ধ করছি।' বলল লোকটা, গালে তিন দিনের না কাটা দাড়ি। কালো, কোঁকড়া চুল গজিয়েছে আঙুলের মোটা মোটা গাঁটে।

'কিন্তু আমার যে ভীষণ খিদে পেয়েছে!' মিনতি করে বলল মুসা। ভ্রু দেখাল কিশোর আর রবিনের উদ্দেশে। 'আমার বন্ধুদেরও।'

'ঠিক আছে।' বলল লোকটা, 'কিন্তু তাড়াতাড়ি করো।' এক অটোগ্রাফ বই তুলে ধরল। 'আমার মেয়ের জন্য পেঙ্গুইনের অটোগ্রাফ নিতে হবে।'

লোকটা কাউন্টারের এক বাক্স থেকে দুটো রবারের দস্তানা বের করল। ও দুটো পরে নিয়ে রুটির মধ্যে চারটে হট ডগ ভরে কাগজের প্লেটের ওপর রাখল।

'ড্রিংক?' জিজ্ঞেস করল।

'তিনটে কোলা।' বলল রবিন। কাউন্টারের ওপর টাকা রাখল।

লোকটা ড্রিংকের বিনিময়ে টাকা নিয়ে খুচরো চাপড়ে রাখল।

'কাউন্টারে শর্ষে আর সস পাবে!' চিৎকার ছেড়ে মঞ্চের উদ্দেশে ধেয়ে গেল।

'রবিন, তুমিও ওঁর অটোগ্রাফ নিতে পারো।' বলল কিশোর। নিজের হট ডগে শর্ষে ঢেলে দিল।

'আছে তো।' জানাল রবিন, 'ওরা যখন আমাকে টিকিটগুলো পাঠাল, খামে পেঙ্গুইনের সই করা এক ছবি ছিল।'

'সার্কাস মিউজিকের শব্দ পাচ্ছি।' বলল মুসা। একসার গাছপালার দিকে ইঙ্গিত করল, 'চলো যাই।'

খেতে খেতে লম্বা গাছগুলোর দিকে এগোল ওরা।

'ক্যারাউজেল!' বলে উঠল রবিন, 'চড়বে নাকি? আমার কাছে টাকা আছে।'

'প্রশ্নই ওঠে না।' মুসা বলল মুখভর্তি হট ডগ নিয়ে, 'আমরা বাচ্চা নাকি?'

'চলো, মুসা, মজা হবে।' বলল কিশোর, 'কত বছর ক্যারাউজেলে চড়িনি! তা ছাড়া আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরাও চড়েছে দেখা যাচ্ছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা।

'ঠিক আছে, কিন্তু আমি কোনো বাচ্চা ভেড়া কিংবা কুকুরছানার পিঠে চাপব না।'

ছেলেরা খাওয়া শেষ করে ব্যারেলের ভেতর আবর্জনা ফেলে হনহন করে টিকিটের জন্য পা চালাল। এক মিনিট বাদে, ক্যারাউজেল থেমে গেল এবং এক দল ছেলেমেয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

রবিন চকচকে কালো এক ঘোড়ার সোনালি স্যাডলে চেপে বসল। মেঝে থেকে ক্যারাউজেলের ছাদ অবধি উঠে যাওয়া সেফটি পোলটা ধরে রইল ও।

কিশোর আগুন ওগরানো এক ড্রাগনের পিঠে চাপল।

মুসা প্রতিটা জানোয়ার পরখ করে শেষমেশ বেছে নিল গর্জনরত এক সিংহকে।

ক্যারাউজেল অপারেটর প্ল্যাটফর্মটাকে ঘুরিয়ে দিল।

'যার যার পোল ধরে থেকো।' মহিলা জানাল। মিনিটখানেক বাদে, ক্যারাউজেল নড়তে শুরু করল।

কিশোরের ড্রাগন ওঠানামা করছে, পোল ধরে রয়েছে ও। ড্রাগনটা হঠাৎই গর্জে উঠে লেজ আগুপিছু করতেই হেসে উঠল কিশোর।

মুসা আর রবিনের দিকে চাইল ও। দুজনই ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল।

'আমার সিংহ তোমার ড্রাগনের চেয়ে আগে চলে!' মুসা চেঁচিয়ে কিশোরকে বলল।

ঠিক এ সময় কিশোর মঞ্চের দিক থেকে চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেল। কী ঘটছে দেখার চেষ্টা করল ও, কিন্তু জনতার ভিড়ে বাধা পেল।

চেঁচামেচি চলছেই এবং কিশোর এখনো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সেফটি পোল চেপে ধরে দেখার সুবিধার জন্য ড্রাগনের পিঠে হাঁটু গেড়ে বসল ও।

কিন্তু ড্রাগনের পিঠটা পিচ্ছিল এবং কিশোর আচমকা অনুভব করল পড়ে যাচ্ছে ও। পিছলে কাঠের প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেল।

'আউ!' কাতরে উঠল।

অ্যাটেনডেন্ট শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল।

'লেগেছে?' প্রশ্ন করে, কিশোরকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'হ্যাঁ, হাত ছড়ে গেছে।' বলল ও, 'খুব ব্যথা করছে।'

'এখানে থাকো!' মহিলা বলল। লিভারের কাছে হেঁটে গিয়ে ক্যারাউজেল বন্ধ করল।

মুসা আর রবিন যার যার মাউন্ট থেকে নেমে পড়ে দৌড়ে এল।

'কী হয়েছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'স্টেজের কাছে চেঁচামেচি শুনে কী ব্যাপার দেখার জন্য

> 'অ্যাভালন আইল্যান্ডের লিজটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। নাছোড়বান্দা লোক, আস্ত অভদ্র। প্রথমে ভালোভাবে মানা করলাম। শোনে না। শেষে দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি।'

ড্রাগনের ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম।' বলল কিশোর, 'পিছলে পড়ে গেছি।'

মুসা কিশোরের কপালে আঙুল রাখল। সামান্য ফুলে উঠেছে জায়গাটা।

'আলু হয়ে গেছে।' বলল।

'বাবাকে ডেকে আনি।' বলে দৌড় দিল রবিন।

এ সময় অ্যাটেনডেন্ট পেনসিল আর কাগজের প্যাড নিয়ে ফিরে এল। কিশোরের কপালে হাত রাখল।

'কপালটাও ফুলে গেছে।' বলল, 'তোমার নাম-ঠিকানা লাগবে। আমাকে সব অ্যাকসিডেন্টের রিপোর্ট করতে হয়।'

কিশোর নাম-ঠিকানা বলছে, এ সময় মি. মিলফোর্ডকে নিয়ে ফিরে এল রবিন।

'তুমি ঠিক আছ তো, কিশোর?' মি. মিলফোর্ড উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

লাল হয়ে গেল কিশোর।

'হাত ব্যথা করছে, আঙ্কেল।' বলল।

মি. মিলফোর্ড কিশোরের বাহু পরখ করলেন, তারপর কপালের ফোলাটা দেখলেন।

'মনে হয় তেমন কিছু হয়নি।' বললেন, 'তবে ফার্স্ট এইড টেন্টে একবার যাওয়া দরকার।'

'ঠিক বলেছেন।' অ্যাটেনডেন্ট বলল। একটা সাইন দেখাল : রাইডে দাঁড়ানো কিংবা হেলান দেওয়া নিষেধ। 'তুমি ওটা দেখোনি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'আমি দেখতে চাইছিলাম স্টেজে গোলমালটা কিসের।' বলল ও।

'ডেবি গিবসনের ছিনতাই হয়ে গেছে!' বলল রবিন।

'কী?' কিশোর আর মুসা একসঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ।' মি. মিলফোর্ড বললেন।

ওরা চারজন ফার্স্ট এইড তাঁবুর দিকে হাঁটছে, মুসা আলতো কনুই মারল কিশোরকে। 'কত পুলিশ এসেছে দেখো!'

ডেবির মঞ্চ ঘিরে রেখেছেন পুলিশ কর্মকর্তারা। অশ্বারোহী কর্মকর্তাটি দর্শকদের সঙ্গে কথা বলছেন। দুজন অফিসার মঞ্চে, ডেবির সঙ্গে দাঁড়িয়ে। গায়িকার লম্বা সঙ্গীটিকে কোথাও দেখা গেল না।

'কী নিয়ে গেছে?' প্রশ্ন করল গোয়েন্দাপ্রধান।

'হীরার পেঙ্গুইন।' বলল রবিন, 'মুখোশ পরা কে একজন গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে!'

তিন

তাঁবুর ভেতর এক লোক লালমুখো এক মহিলার হাতে এক গ্লাস পানি তুলে দিচ্ছিলেন। একটি ছেলে দাঁড়িয়ে মহিলার চেয়ারের পাশে।

'এখন কেমন লাগছে, মা?' ছেলেটি প্রশ্ন করল।

'আগের চেয়ে অনেক ভালো, রনি,' ওর মা বললেন। 'ধন্যবাদ, ডক্টর...'

'ফ্লেমিং।' জানালেন লোকটি। সাদা জ্যাকেটের পকেটে পিন দিয়ে লাগানো ট্যাগের দিকে চোখ নামিয়ে চাইলেন।

মহিলা উঠে দাঁড়ালেন।

'চল, রনি, আমরা লেমোনেড খাই,' ছেলেকে বললেন। 'আবারও ধন্যবাদ, ড. ফ্লেমিং।'

'নো প্রবলেম।' ডাক্তার বললেন। চকিতে মি. মিলফোর্ড ও তিন কিশোরের দিকে চাইলেন, 'রোগী কে?' জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি।' জানাল কিশোর।

ডাক্তার দুটো ফোল্ডিং চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'বসো, প্লিজ।'

তাঁবুতে আর কোনো চেয়ার নেই।

'আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।' মি. মিলফোর্ড বললেন। তাঁবুর খোলা মুখের দিকে মুসা আর রবিনকে নিয়ে পা বাড়ালেন।

'সাহস রেখো, কিশোর।' কিশোরকে বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল কিশোর।

'তোমার নাম কিশোর?' ডাক্তার প্রশ্ন করলেন। এক বাক্স থেকে দুটো রাবারের পাতলা গ্লাভস বের করে হাতে পরে নিলেন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'আসল নাম কিশোর পাশা।'

কিশোরের উল্টো দিকের চেয়ারে বসলেন ডাক্তার। ওর কপালের ফোলাটা স্পর্শ করলেন।

'এটা কীভাবে হলো?' প্রশ্ন করলেন।

কিশোর ডাক্তারকে জানাল কীভাবে ক্যারাউজেল থেকে পড়ে গিয়ে বাহু ছড়ে গেছে।

'ব্যথা আছে?' ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'অল্প, বাঁকা করলে লাগে।'

'বাঁকা কোরো না।' ডাক্তার বললেন।

এ সময় এক পুলিশ অফিসার মাথা গলিয়ে দিলেন তাঁবুর ভেতর।

'মাফ করবেন, ডক।' অফিসার বললেন, 'কাউকে আপনার তাঁবুর পাশ দিয়ে কিছুক্ষণ আগে দৌড়ে যেতে দেখেছেন?'

'না, আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম,' ড. ফ্লেমিং জানালেন। 'কেন, কী হয়েছে?'

'কে যেন ডেবি গিবসনের হিরের নেকলেসটা ছিনতাই করেছে,' অফিসার বললেন। 'শয়তানটা মিশে গেছে ভিড়ের মধ্যে।'

'ঠিকই ধরা পড়বে!' বললেন ডাক্তার।

'তাই তো আশা করছি!' বললেন অফিসার। 'মিস গিবসন হয়তো চোরকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন, তাই মেইন এক্সিট গেটে সবাইকে থামানো হচ্ছে।'

পুলিশ অফিসার বিদায় নেওয়ার পর কিশোরের দিকে ফিরলেন ডাক্তার।

'তোমার হাতটা ব্যান্ডেজ করে দিয়ে আমার অফিসে যাব,' বললেন ডাক্তার। 'এক্স-রে করতে হবে।'

সাদা এক ক্যাবিনেট থেকে সিল করা ব্যান্ডেজ টেনে বের করলেন ডাক্তার।

'আমি তোমার বাহু বেঁধে দিচ্ছি, তুমি আস্তে আস্তে ওই সাইনটা পড়ো।'

সাইনটার দিকে চাইল কিশোর।

'কেন? আমার চোখ তো ঠিক আছে,' বলল কিশোর।

ডাক্তার প্যাকেটটা খুললেন।

'শিওর হতে চাই তোমার মাথায় চোট লাগেনি। পড়তে থাকো' বলে কিশোরের বাহু ব্যান্ডেজ করতে লাগলেন।

কিশোর পড়তে শুরু করল :

কীভাবে সানস্ট্রোক এড়াবেন—

১. সব সময় সানব্লক ব্যবহার করুন।

২. হ্যাট পরুন।

৩. বেশিক্ষণ রোদের মধ্যে থাকবেন না।

৪. গরমের দিনে অতিরিক্ত কষ্টকর ব্যায়াম করবেন না।

৫. প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন।

'তোমার পড়ার ভঙ্গিটা খুব সুন্দর,' বললেন ডাক্তার। বাহু মোড়া শেষ করেছেন। 'আঙুলগুলো মুড়ে আবার খোলো তো দেখি।'

কিশোর ডাক্তারের কথামতো কাজ করে বাহুর দিকে তাকাল। ব্যান্ডেজটা ওর কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত গেছে। ধাতব ছোট্ট এক ক্লিপ ব্যান্ডেজের শেষ প্রান্তটাকে জায়গামতো ধরে রেখেছে।

'বেশি টাইট লাগছে?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

'না, কিন্তু ভেতরটা কেমন যেন লাগছে।'

'ব্যান্ডেজ করলে তা একটু লাগেই,' বললেন ডাক্তার। 'এখন তোমার বাবাকে ডাকা যাক।'

'উনি আমার বন্ধুর বাবা।' জানাল কিশোর।

ডাক্তার তাঁবুর দোরগোড়ায় হেঁটে গিয়ে সবাইকে ভেতরে ডাকলেন।

'কী অবস্থা?' প্রশ্ন করল মুসা।

'ভালো।' বলল কিশোর।

'আমি আমার অফিসে কিশোরের হাতটা এক্স-রে করতে চাই,' মি. মিলফোর্ডকে বললেন ডাক্তার। 'আপনারা আমার সাথে হাসপাতালে যাবেন?'

'নিশ্চয়ই,' মি. মিলফোর্ড বললেন। 'এখনই যেতে চান?'

'দেরি না করাই ভালো' বলে ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার। 'আমার বদলি একটু পরই চলে আসবে এখানে।'

তাঁবু ত্যাগ করে মেইন এক্সিটের দিকে এগোল দলটা।

কিশোর লক্ষ করল প্রেস্টো পিৎজা আর লেমোনেড স্ট্যান্ডের মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা। ফ্র্যাঙ্ক আর তার হট ডগের গাড়ি উধাও।

বেরোনোর পথের কাছে, একসার লোক কী সব বলাবলি করছে। বন্ধ গেটটা পাহারা দিচ্ছেন দুজন পুলিশ অফিসার।

কিশোরের সামনে বসে ছিল, হলদে চুলের সেই মহিলাটি এক অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। মুখের চেহারা ফ্যাকাশে আর ক্রুদ্ধ তার।

'আমাকে বেরোতে দিন!' দাঁতের ফাঁকে বলল মহিলা।

'প্লিজ, আপনাদের সবাইকে আরও খানিকক্ষণ এখানে থাকতে হবে,' আরেক অফিসার ব্যাখ্যা করলেন। 'মিস গিবসনের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমার সঙ্গে এসো,' বললেন ডাক্তার। কিশোরের কাঁধে হাত রেখে লাইনের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

'হাই, ডক।' অফিসার বললেন। কিশোর চিনতে পারল, ইনি ফার্স্ট এইড তাঁবুতে উঁকি দিয়েছিলেন।

'হ্যালো, অফিসার। দেখুন এই রোগীকে এখনই আমার অফিসে নিয়ে যাওয়া দরকার,' ড. ফ্লেমিং বললেন। কিশোরের কাঁধে তখনো হাত রাখা। 'এ হাতে ব্যথা পেয়েছে এবং সম্ভবত কানকাশনও হয়েছে।'

'নো প্রবলেম, ডক।' অফিসার বললেন। পার্টনারের উদ্দেশে মাথা নাড়তেই তিনি গেটটা টেনে খুলে দিলেন।

তিন গোয়েন্দা, মি. মিলফোর্ড আর ড. ফ্লেমিং গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

চার

'আমি ওই লটে পার্ক করেছি।' রাস্তা পেরোনোর সময় মি. মিলফোর্ড বললেন, 'নীল রঙের স্টেশন ওয়াগন।'

'আমিও।' জানালেন ড. ফ্লেমিং। 'আমারটা লাল জিপ। হাসপাতালটা মাইলখানেক দূরে।'

ছেলেরা আর মি. মিলফোর্ড লাল জিপটাকে অনুসরণ করে বড় রাস্তার দক্ষিণ দিকে চলতে লাগল।

'হাতের কী অবস্থা?' মি. মিলফোর্ড প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।' জানাল কিশোর।

মুসা বড় করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কেউ কেউ মনোযোগ পাওয়ার জন্য কত কিছুই করে।' বলল।

কয়েক মিনিট পর, ড. ফ্লেমিং হার্টফোর্ড হাসপাতালের সামনে ছোট এক পার্কিং লটে ঢুকলেন। হাসপাতালের স্টাফদের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় গাড়ি পার্ক করলেন।

মি. মিলফোর্ড ভিজিটরদের জায়গায় গাড়ি পার্ক করলেন এবং সবাই বেরিয়ে এলেন।

একটা সাইড ডোর দিয়ে দলটিকে নিয়ে লম্বা এক করিডরে বেরিয়ে এলেন ড. ফ্লেমিং।

> 'থাক, থাক, কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না,' দুষ্টুমিমাখা কণ্ঠে বলল ওয়েবার। 'ভেবেছ এমনি এমনি যেতে রাজি হয়েছি? গরম একটা খবরের গন্ধ পাচ্ছি, বুঝলে? নাকি আমার আন্দাজ ভুল?'

এলিভেটরে চেপে চারতলায় উঠে এলেন সবাই, তারপর আরেকটা হলওয়ে ধরে এগোলেন।

সবুজ অক্ষরে এক দরজায় লেখা: এক্স-রে। সেটা ঠেলে খুললেন ড. ফ্লেমিং। সবাই ভেতরে ঢুকলে ড. ফ্লেমিং কয়েকটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

'আপনারা এখানে বসুন, আমি গোটা দুই এক্স-রে নিয়ে নিই। দশ মিনিটের মতো লাগবে।'

ড. ফ্লেমিং কিশোরকে পেছনে নিয়ে এক দরজা দিয়ে ছোট এক ঘরে প্রবেশ করলেন। সাদা শিটে ঢাকা এক টেবিল দেখিয়ে ওকে শুয়ে পড়তে বললেন। এবার একটা লিড অ্যাপ্রন রাখলেন কিশোরের বুকের ওপর।

ছোট এক বালিশে মাথা রেখে ছাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিশোর। কানে আসছে, ড. ফ্লেমিং ড্রয়ার আর কাবার্ড খুলছেন-লাগাচ্ছেন। এবার ও একটি এক্স-রে মেশিন স্লাইড দেখতে পেল টেবিলের ওপর।

ড. ফ্লেমিংয়ের মুখ দেখা গেল মেশিনটার পাশে।

'নড়াচড়া কোরো না, চুপ করে শুয়ে থাকো।' বললেন তিনি। বুকের ওপর কিশোরের হাত আড়াআড়ি করে রাখলেন, 'আমি "এক" বললে শ্বাস বন্ধ করবে। "দুই" বললে ছাড়বে।'

ড. ফ্লেমিংয়ের মুখ উধাও হয়ে গেল। কয়েক ফিট দূর থেকে তিনি বললেন, 'এক!'

কিশোর শ্বাস বন্ধ করল। কিছু একটা টিক করে উঠতে শুনল ও। এবার ড. ফ্লেমিংয়ের কণ্ঠ বলল, 'দুই! তুমি এখন শ্বাস ছাড়তে পারো।'

ড. ফ্লেমিংকে আবারও টেবিলের পাশে দেখা গেল।

'আমি ও ঘরে গিয়ে এটা দেখব,' বললেন। 'এখনই

ফিরছি।'

ড. ফ্লেমিং না ফেরা অবধি ছাদের টালি গুনে গেল কিশোর।

'এটা ঝাপসা এসেছে' বলে টেবিলে একটা এক্স-রে রাখলেন ড. ফ্লেমিং। মোটা লাল মার্কার নিয়ে এক্স-রেটার ওপর বড় করে একটি এক্স আঁকলেন। 'ব্যান্ডেজ ছাড়া আরেকটা শুট করতে হবে।'

ড. ফ্লেমিং কিশোরের বাহুর ব্যান্ডেজ খসাতে শুরু করলেন।

'ওই যে ওই সাইনটা দেখতে পাচ্ছ?' কিশোরকে প্রশ্ন করলেন। 'পড়ে শোনাও দেখি।'

কিশোর সাইনটা পড়ল। দুধ খেলে হাড় শক্ত হয়—এ বিষয়ে একটা লেখা।

'ওখানে?' বলে কিশোরের কাঁধের পাশে একটি টেবিলের ওপর আনরোল্ড ব্যান্ডেজটা আলতো করে ছুড়ে দিলেন ড. ফ্লেমিং। আবারও কিশোরের বাহুর অবস্থান ঠিক করলেন, 'শুয়ে শ্বাস চেপে থাকো। আমি নিতে বললে নেবে।'

কিশোর ডাক্তারের কথামতো কাজ করল এবং এক মিনিট বাদে, ড. ফ্লেমিং ফিরে এসে ওকে উঠে বসতে বললেন। 'এটা ডেভেলপ করার পর তুমি যেতে পারবে।' কয়েক মিনিট পর বললেন, 'এটা অনেক পরিষ্কার এসেছে। হাতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আমি ব্যান্ডেজটা লাগিয়ে দিচ্ছি। আগামী কয়েক দিন বেসবল বন্ধ, ওকে?'

কিশোর ড. ফ্লেমিংকে আবার বাহু মুড়তে দেখল।

'তোমার ডাক্তারকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নিয়ো,' বললেন ডাক্তার। দরজা খুলে অন্যদের ঢুকতে বললেন।

এক্স-রেটা দেখালেন মি. মিলফোর্ডকে।

'কোনো ফ্র্যাকচার হয়নি,' বললেন ডাক্তার। 'একটু চোট লেগেছে শুধু।'

'আমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে।' বন্ধুদের জানাল কিশোর।

'এক্স-রেটা আমরা নিয়ে যাব।' বললেন মি. মিলফোর্ড।

'নিশ্চয়ই।' ড. ফ্লেমিং বললেন। ড্রয়ার থেকে বড়সড় এক খাম বের করে এক্স-রেটা ভরে দিলেন।

'অন্য আরেকটা যেটা করেছেন, সেটা নিতে পারি?' কিশোর প্রশ্ন করল। 'যেটা ভালো হয়নি বললেন।'

'না, আমি ওটা ফেলে...ঠিক আছে, নাও,' ড. ফ্লেমিং বললেন। অপর এক্স-রেটার সঙ্গে খামে ওটাও ভরে কিশোরের হাতে দিলেন। 'আর কখনো চলন্ত ক্যারাউজেলে উঠে দাঁড়িয়ো না কিন্তু।' বললেন ড. ফ্লেমিং।

পাঁচ

সেদিন সন্ধেবেলায়, টিভির সামনে চাচা-চাচির সঙ্গে বসে ডিনার করল কিশোর। চাচি ওকে মাংস কেটে দিলেন। বানিয়ে দিলেন ওর প্রিয় কুকি। কোলে রাখা এক বালিশের ওপর ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটা রেখেছে কিশোর।

রাশেদ পাশা চোখ টিপলেন কিশোরের উদ্দেশে।

'কোনো কোনো ছেলে কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সবকিছুই করে।'

'দেখো, দেখো, ডেবি গিবসন!' বললেন মেরি পাশা। টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দিলেন।

এক রিপোর্টার ইন্টারভিউ নিচ্ছে গায়িকার চুরি যাওয়া নেকলেস প্রসঙ্গে। কিশোর তাদের পেছনে সাদা পেঙ্গুইন ট্রেইলারটা দেখতে পেল।

'ওটা বিশেষ একজনের দেওয়া উপহার।' পেঙ্গুইন বলল, 'জিনিসটা চুরি যাওয়ায় আমি খুব শকড আর ক্ষুব্ধ।'

'খারাপ লাগারই কথা,' রিপোর্টার বলল। 'আপনার ফ্যানদেরও খারাপ লাগছে। আপনি কি কাল আবার আরেকটা কনসার্ট করবেন?'

'না, আমি খুবই আপসেট,' বলল ডেবি। 'এ মুহূর্তে গান গাইবার কথা ভাবতে পারছি না। সবাই যেন টাকা ফেরত পায়, তার ব্যবস্থা করব।'

ক্যামেরা সরে গেল ডেবির ওপর থেকে।

'ঘটনাটা এ রকম,' ক্যামেরায় বলল রিপোর্টার। 'কেউ একজন অটোগ্রাফ চাওয়ার ছুতোয় ডেবি গিবসনের প্রিয় নেকলেসটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তার মুখে পেঙ্গুইনের মুখোশ ছিল।'

ফোন বেজে উঠল। মেরি চাচি জবাব দিয়ে পোর্টেবল ফোনটা কিশোরকে দিলেন।

'হ্যালো!' বলল ও।

'দেখেছ?' রবিন প্রশ্ন করল। 'চোরটা ভক্তদেরই কেউ একজন!'

'হ্যাঁ, বিশ্রী ব্যাপার।' বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

কিশোর সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। কী যেন মনে করার চেষ্টা করছে, এ সময় রবিন বলল, 'কিশোর?'

'হুঁ,' বলল ও। 'শোনো, আমি কাল ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরার পর এসো, ঠিক আছে?'

কিশোর ফোন কেটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা আবার বেজে উঠল।

'হ্যালো?'

'আমার মনে হয় কাজটা হট ডগওয়ালার!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ওর কাছে অটোগ্রাফ বই ছিল, মনে আছে?'

'অনেকের কাছেই ছিল।' কিশোর বলল। এবার কিছু একটা মনে পড়ল, 'মুসা? আমরা ফার্স্ট এইড তাঁবু থেকে বেরোনোর পর আর হট ডগের গাড়িটাকে দেখিনি।'

'বললাম না!' বলে উঠল মুসা। 'আঙুলে চুলওয়ালা লোকটাই চোর!'

'হতে পারে,' বলল কিশোর। 'কালকে একবার আসবে? তিনজন মিলে ব্যাপারটা নিয়ে যাতে আলোচনা করতে পারি।'

'লাঞ্চ কখন?' মুসা প্রশ্ন করল। কিশোর হেসে উঠে ফোন রেখে দিল।

রাশেদ পাশা টিভি অফ করে একটা বই তুলে নিলেন।

বইটা দেখে হলদেচুলো মহিলার কথা মনে পড়ল কিশোরের। কনসার্টের সময় ওর সামনে যিনি বসে ছিল।

হাতে ছিল অটোগ্রাফ বই।

এবং চুরির ঘটনার পর পার্ক ত্যাগ করতে না দেওয়ায় পুলিশ অফিসারের ওপর খুব খেপে গিয়েছিল।

পরদিন সকাল দশটায় চাচির সঙ্গে গাড়িতে চড়ে মেইন স্ট্রিটের ফ্যামিলি মেডিসিন ক্লিনিকে গেল কিশোর।

রিসেপশনিস্ট ওদের ড. ব্রডের অফিসে নিয়ে গেল। ড. ব্রড ঝটপট এক জোড়া রাবারের দস্তানা পরে নিলেন।

এক্স-রের খামটা তাঁর হাতে দিল কিশোর।

'এটা কী?' ড. ব্রড প্রশ্ন করলেন, বাতিল এক্স-রেটা তুলে ধরলেন।

'ব্যান্ডেজসহ এটা তোলা হয়।' ব্যাখ্যা করল কিশোর, 'ডাক্তার বললেন ঝাপসা এসেছে, তাই ব্যান্ডেজ খুলে আরেকটা এক্স-রে নেন।' কিশোর খামটার দিকে নির্দেশ করল।

ড. ব্রড এক্স-রেটা খামে ঢুকিয়ে অন্যটা বের করলেন। ওটাকে এক লাইট বোর্ডে জুড়ে কিশোরের বাহুর হাড়গুলো পরীক্ষা করলেন।

'সব তো ঠিকই আছে,' বললেন ডাক্তার। 'কোনো

সমস্যা নেই। সামান্য একটু চোট লেগেছে শুধু, কিশোর।'

ড. ব্রড কিশোরের ব্যান্ডেজ খুলে বাহু পরীক্ষা করলেন। এবার ছড়ে যাওয়া জায়গাটা পরিষ্কার করে একটা স্টেরাইল ব্যান্ড-এইড লাগিয়ে দিলেন।

'কয়েক দিন কোনো খেলাধুলা নয়,' বললেন। 'আর ক্যারাউজেল থেকে দূরে থেকো!'

ছয়

পরে কিশোরের রুমে, কিশোরের ডেস্কের ওপরে গ্রিনহিলস নিউজপেপারটা বিছিয়ে দিল রবিন। ডেবি গিবসনের বিরাট এক ছবি এবং তার পেঙ্গুইন নেকলেসের একটি ড্রইং। ছবিগুলোর নিচে ক্যাপশন লেখা, 'ডেবির নেকলেস চুরি!'

'ডেবি রিপোর্টারকে কী বলেছেন, শোনো।' বলল রবিন, ছবি দুটোর নিচের প্যারাগ্রাফটা পড়ল।

'আমি সব সময় বিরতির সময় অটোগ্রাফ দিই। আমি সই করছিলাম আর ভক্তদের ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম। এ সময় কেউ একজন আমার নেকলেসটা ছিনিয়ে নেয়। চোখের পলকে ঘটে যায় ব্যাপারটা। আমি কিছু করতে পারার আগেই চোর দৌড়ে পালিয়ে যায়।'

'আরেকটু হলেই আমরা সাক্ষী হতে পারতাম!' বলল মুসা।

'আমরা ক্যারাউজেলে চড়ার পর নেকলেসটা চুরি গেছে।' ওকে মনে করিয়ে দিল কিশোর।

কিশোরের উদ্দেশে দুষ্টু হাসি হাসল মুসা।

'আমরা দুজন ক্যারাউজেলে ছিলাম।' বলল ও, 'তুমি পড়ে যাচ্ছিলে!'

'আমি ইচ্ছে করে পড়িনি।' বলল কিশোর, বাহু ঘষল।

রবিন তখনো পড়ছে।

'এখানে বলছে, ডেবি গেটের পাশে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে পার্ক থেকে বেরোতে দেখেছেন।' বলল ও, 'কিন্তু চোরকে চিনতে পারেননি।'

'চোর হয়তো আগেই সটকে পড়েছে।' বলল মুসা, 'নেকলেসটা চুরি করে গেট লাগিয়ে দেওয়ার আগেই পগারপার।'

কিশোর রবিনকে নিখোঁজ হট ডগের গাড়িটার কথা জানাল।

'স্রেফ উধাও হয়ে গেছে?' প্রশ্ন করল রবিন।

শ্রাগ করল কিশোর।

'আমরা ফার্স্ট এইড তাঁবু থেকে বেরোনোর পর ওটাকে আর দেখিনি।' বলল ও।

'আমার কথাই ঠিক!' মুসা বলল, 'হট ডগওয়ালাই ডেবি গিবসনের নেকলেস চুরি করেছে!'

'করতে পারে।' কিশোর বলল, 'কিন্তু কনসার্টের সময় আমার সামনে বসে থাকা মহিলার কথা তোমাদের মনে আছে?'

রবিন আর মুসা মাথা ঝাঁকাল।

'তার কাছে অটোগ্রাফ বই ছিল।' বলল কিশোর, 'ডেবি গিবসন বিরতি ঘোষণা করার পরপরই সে দৌড়ে মঞ্চে চলে যায়। পরে পুলিশরা যখন সবাইকে এক্সিটের কাছে থামাচ্ছিল, মহিলা খেপে লাল হয়ে যায়। ওই মহিলাই হয়তো হিরের নেকলেসটা চুরি করেছে!'

'ডেবি কখনোই বলেননি যে চোর পুরুষমানুষ।' মন্তব্য করল নথি। নজর ফেরাল খবরের কাগজের দিকে, 'শুধু বলেছে, কেউ একজন ওর নেকলেস চুরি করেছে।'

'কাজেই নারী-পুরুষ যে কেউই চোর হতে পারে,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে, 'এমনকি লম্বা কোনো ছেলে কিংবা মেয়েও!'

'ডেবি হয়তো আজ চোর সম্পর্কে কিছু মনে করতে পারবেন।' বলল নথি, 'কাল এতটাই মন খারাপ ছিল যে হয়তো জরুরি কোনো কথা ভুলে গেছিল। ওর সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়?'

'এতই সোজা!' বলল মুসা, 'এত বড় একজন তারকা তিনটে ছোট ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চাইবে কেন?'

রবিন ওর খবরের কাগজটা আঁকড়ে ধরল।

'আমার মনে হয় চাইবে। আমার বাসায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখা করো!'

'কিন্তু আমার খিদে পেয়েছে যে!' মুসা বলল, 'তোমাদের কি খিদেটিদে পায় না?'

কিন্তু রবিন ইতিমধ্যেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

'নিচে চলো।' মুসাকে বলল কিশোর, 'চাচি গতকাল রাতে পিনাট বাটার কুকি বানিয়েছে।'

মুসা বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল।

'যাক, শেষমেশ কেউ একজন আমার কথা ভাবল!' বলে কিশোরকে অনুসরণ করে কামরা ছাড়ল।

কিশোর কিচেন টেবিলে একটা চিরকুট পেল : 'চাচার সঙ্গে বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে।—চাচি।'

কিশোর কাগজটা উল্টে নিজের একটা মেসেজ লিখল : 'মুসা আর রবিনের সঙ্গে বাইরে গেলাম।—কিশোর।'

কিশোর আর মুসা দুজনই দুধ দিয়ে দুটো করে কুকি খেল। বেরোনোর সময় কিশোর শেষ দুটো কুকি তুলে নিল।

'একটা আমাকে দেবে?' মুসা প্রশ্ন করল।

'উঁহু, এ দুটো রবিনের জন্য।' বলল কিশোর।

রবিনের বাসায় হেঁটে গেল ওরা। বেল বাজাতেই রবিন দরজা খুলল। ওর হাতে ডেবি গিবসনের ফটোগ্রাফ, নিচে গায়িকার স্বাক্ষর।

'ডেবি যখন দেখবেন যে পেছনে আমি কী লিখেছি, তখন কথা বলবেন।' বলল নথি। কিশোরের হাত থেকে কুকি দুটো নিল। একটা দিল মুসাকে।

ছবিটা উল্টে দিল ও। রবিনের চিরকুটে লেখা :

'প্রিয় মিস গিবসন,

আপনার হিরের নেকলেস যে চুরি করেছে, তার ব্যাপারে আমাদের কাছে তথ্য আছে।

রবিন মিলফোর্ড

কিশোর পাশা

ও

মুসা আমান'

সাত

'এতে কী হবে বুঝতে পারছি না।' বলল মুসা।

কুকিতে কামড় দিল রবিন।

'আমার চিরকুট পড়লে ডেবি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন, দেখো।' বলল ও।

'কিন্তু আমাদের কাছে কী তথ্য আছে?' নিজের কুকিতে কামড় দিয়ে বলল মুসা।

'কিছু একটা ভেবে নেব।' বলল রবিন, 'চলো যাই!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির অন্দরের উদ্দেশে চেঁচাল।

'মা, আমি কিশোর আর মুসার সঙ্গে বেরোচ্ছি!'

ছেলেরা মেইন স্ট্রিটে গিয়ে হার্টফোর্ডের বাস ধরল। পেছনের দিকে বসল ওরা।

'একটা কাজ করা যায়, আমরা হট ডগওয়ালার বর্ণনা দিতে পারি।' বলল মুসা, 'সে যদি চোর হয়, ডেবি হয়তো তাকে মনে করতে পারবেন।'

'আর আমি আমার সামনে বসে থাকা মহিলার কথা

বলতে পারব।' বলল কিশোর, 'দুজনের কাছেই অটোগ্রাফ বই ছিল আর দুজনই খুব তাড়াহুড়ো করছিল।'

বুশনেল পার্কের কাছেই ওদের নামিয়ে দিল বাস।

'হোটেলটা অন্য পাশে।' বলল রবিন।

পার্কের ভেতর দিয়ে পথ করে নিল ওরা, পাশ কাটাল ক্যারাউজেলটার। সার্কাস মিউজিক বাজছে। কটা ছেলেমেয়ে বসা মাউন্টে।

'চড়বে নাকি, কিশোর?' ঠাট্টা করে বলল মুসা।

'না, তুমি চড়ো।' বলল কিশোর, 'নাকি একা চড়তে ভয় করবে?'

'প্রশ্নই ওঠে না!' বলল মুসা।

'ওই যে হোটেলটা।' বলে রাস্তার ওপাশে আঙুল তাক করল রবিন।

মঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। চেয়ারগুলো নেই, তবে মঞ্চে ওঠার ধাপগুলো এখনো রয়েছে।

'এসো ভালো করে দেখি।' বলল কিশোর।

মঞ্চের কাছে হেঁটে গেল ওরা, ফার্স্ট এইড তাঁবুটার পাশ কাটাল। কিশোর ভেতরে উঁকি দিল। চেয়ার দুটো আর সানস্ট্রোক সম্পর্কে লেখা সাইনটা ছাড়া আর কিছু নেই।

মুসা মঞ্চে উঠে অদৃশ্য শ্রোতাদের দিকে তাকাল।

'খাইছে, আমি হয়তো একদিন মস্ত বড় রকস্টার হব।' বলল, 'হাজারো লোক আমার অটোগ্রাফ চাইবে।'

মঞ্চের ধাপের চারপাশের মাটি পরখ করছে রবিন।

'ডেবি সম্ভবত এই ধাপগুলো দিয়ে নেমে এসে অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন।' বলল ও, 'চোরটা এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় ছিল, কখন নিজের পালা আসবে!'

ঝুঁকে পড়ে প্লাস্টিকের ছোট একটা কৌটা তুলে নিল নথি।

'এতে মনে হয় ক্যামেরার ফিল্ম ছিল।' বলল, 'এটা ক্লু হতে পারে।'

কিশোর এক জোড়া ভাঙাচোরা সানগ্লাস কুড়িয়ে নিল।

'তুমিও এসো,' মুসার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল ও।

'কী জন্য?' প্রশ্ন করল মুসা; মঞ্চের কিনারে বসে রয়েছে সে।

'ক্লু খোঁজার জন্য।' বলল রবিন। একটা এক ডলারের নোট তুলে ধরল, 'দেখো কী পেয়েছি!'

চোখের পলকে মাটিতে নেমে এল মুসা। মিনিট পাঁচেক তল্লাশি চালানোর পর, ছোট্ট একটা স্তূপ তৈরি হলো : ভাঙা সানগ্লাস, খালি ফিল্মের কৌটা, একটা পেনসিল, এক ডলার, এক পেনি, দশটা টিকিটের ছেঁড়া টুকরা, সাতটা চ্যাপটা পেঙ্গুইনের মুখোশ আর শ খানেক ক্যান্ডির মোড়ক।

মুখোশ, টিকিট আর মোড়কগুলো ট্র্যাশ বিনে ফেলে দিল ওরা। রবিন অন্য জিনিসগুলো পকেটে পুরে নিল। এবার হোটেলের উদ্দেশে পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা।

ট্রেইলারটাকে দেখা গেল না।

'ডেবি যদি এখানে না থাকেন?' জিজ্ঞাসা করল কিশোর, 'কনসার্ট বাতিল করে হয়তো বাড়িতে ফিরে গেছেন।'

'এটা তো আগে ভাবিনি।' বলল রবিন, 'এখুনি জানা যাবে।'

ছেলেরা হোটেল লবিতে ঢুকে লম্বা এক রিসেপশন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। কাউন্টারের পেছনে দুজন কেরানি দাঁড়িয়ে। একজন কথা বলছে টেলিফোনে, কাজেই অপরজনের সঙ্গে কথা বলল রবিন।

'মাফ করবেন, ডেবি গিবসন কি এখনো এখানে আছেন?' প্রশ্ন করল।

মহিলা রবিনের দিকে চাইল।

'তুমি... ?'

'আমি রবিন মিলফোর্ড।' বলল ও, 'ডেবি গিবসন আমাকে এই সই করা ছবিটা পাঠিয়েছিলেন।' এবার উল্টে দিল ওটা, মহিলা যাতে পড়তে পারে।

'যখন ঘটনাটা ঘটে তখন আমরা ওখানে ছিলাম।' বলল রবিন, 'মিস গিবসন হয়তো শুনতে চাইবেন আমরা যা জানি।'

কেরানি রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল।

'হ্যালো, কয়েকটা ছেলে মিস গিবসনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। লবিতে আছে। ওরা বলছে, তার চুরি যাওয়া হিরেটা সম্পর্কে তথ্য আছে ওদের কাছে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দিল মহিলা।

'রুম ১২০০, ১৩ তলায়।' বলল, 'ডান দিকে এলিভেটর।'

ছেলেরা এলিভেটরগুলো খুঁজে নিয়ে একটায় ঢুকল। মুসা বোতাম টিপতেই শাঁ করে ওপরে উঠতে লাগল ওরা।

এলিভেটরের দরজা খুলতেই দেখতে পেল, এক লোক ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিশোর এই লোককেই দেখেছিল মিস গিবসনকে মঞ্চের দিকে নিয়ে যেতে। ওদের দেখে সন্তুষ্টির ছাপ ফুটল না লোকটির মুখে।

'আমি মিস গিবসনের ম্যানেজার।' বলল সে। তীক্ষ্ণ, ইগলচোখে ছেলেদের দিকে তাকাল সে, 'কী আছে তোমাদের কাছে?' চওড়া বুকের ওপর বাহুজোড়া আড়াআড়িভাবে রাখা।

'আমরা, আম...' রবিন বলতে শুরু করেছিল।

'দুজন মানুষকে সন্দেহজনক আচরণ করতে দেখেছি আমরা।' বলল কিশোর, 'তাদের একজন চুরিটা করে থাকতে পারে।'

লোকটির পেছনে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন ডেবি।

'থ্যাংকস, হ্যান্স।' বললেন।

কাছ থেকে দেখে বিখ্যাত রকস্টার মনে হয় না ডেবিকে। পরনে সোয়েট শার্ট। মাথার চুল পনিটেইল করা।

'ভেতরে এসো।' বললেন ডেবি। ছেলেদের পেছনে নিয়ে স্যুইটে ঢুকলেন তিনি। হ্যান্স ওদের অনুসরণ করল। বুশনেল পার্কমুখী বিশাল এক কামরায় এ মুহূর্তে ওরা।

'বসো, প্লিজ।' ডেবি বলল। সাদা এক সোফায় একসঙ্গে বসল ছেলেরা।

একটা দরজা দিয়ে উধাও হলো হ্যান্স।

'সন্দেহজনক মানুষ দুটো সম্পর্কে বলো, শুনি।' বললেন ডেবি। ছেলেদের উল্টো দিকে সাদা একটা চেয়ারে বসলেন।

হট ডগ বিক্রেতার বর্ণনা দিল কিশোর।

'তার কাছে একটা অটোগ্রাফ বই ছিল।' বলল ও, 'বলেছিল মেয়ের জন্য নাকি আপনার অটোগ্রাফ নেবে।'

'মনে পড়ছে না।' জানালেন ডেবি।

'লোকটার আঙুলের গাঁটগুলো লোমে ভরা।' যোগ করল মুসা।

'আর বিরতির সময় কার্ট নিয়ে চলে যায় সে।' বলল কিশোর, 'আপনার নেকলেস চুরি যাওয়ার পরপরই।'

মাথা ঝাঁকালেন ডেবি।

'অদ্ভুত। বিরতির সময় ওর তো প্রচুর হট ডগ বিক্রি করার কথা। তবে ও রকম কোনো লোকের কথা মনে পড়ছে না আমার। আর অন্যজন?'

'হলদেচুলো লম্বা এক মহিলা।' বলল কিশোর, 'তার

কাছেও অটোগ্রাফ বই ছিল। আপনি বিরতি নিতেই মঞ্চের দিকে চলে যায় সে। পরে তাকে আমি পুলিশদের সঙ্গে তর্ক করতে দেখেছি।'

ডেবি একটা ছোট টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ারটা টেনে খুললেন।

'অটোগ্রাফ বই দুটোর কোনোটা কি এ রকম দেখতে?' জিজ্ঞাসা করলেন।

আট

ছেলেদের দেখানোর জন্য অটোগ্রাফ বইটা তুলে ধরলেন ডেবি।

'চোর এটা আমার হাতে রেখেই পালিয়েছে।' বললেন তিনি।

ডেবি গিবসন বইটা রবিনের হাতে দিলেন। চৌকো বইটার গাঢ় লাল প্রচ্ছদে 'অটোগ্রাফ' শব্দটা ছাপা।

'অন্য দুটো অটোগ্রাফ বইয়ের কথা ভালোমতো মনে নেই আমার।' বলল কিশোর, 'ওগুলোও এটার মতো মোটাসোটা ছিল, কভারও মনে হয় গাঢ় রঙের ছিল।'

রবিন ওর হাতে ধরা বইটা নিরিখ করল।

'পুলিশ এটা থেকে চোরের আঙুলের ছাপ পেতে পারে।' বলল ও।

'আমি ও ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু ওর হাতে গ্লাভস ছিল।' জানালেন ডেবি।

'খাইছে। হট ডগওয়ালার হাতেও গ্লাভস দেখেছি!' বলল মুসা।

শ্রাগ করলেন ডেবি।

'যে কেউ গ্লাভস পরে নিতে পারে।' বলল ও।

'চোর কি কোনো মহিলা হতে পারে?' রবিনের প্রশ্ন, 'হাত লুকাতে হয়তো গ্লাভস পরেছিল।'

'হতে পারে।' বললেন ডেবি। 'সবার মুখে পেঙ্গুইন মুখোশ ছিল, তাই আমি কারও মুখের দিকে তাকাইনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন ডেবি।

'যে কেউ আমার নেকলেসটা নিয়ে থাকতে পারে। কী ঘটেছে, বোঝার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিই আমি।' বললেন তিনি, 'কিন্তু ততক্ষণে চোর মিশে গেছে মানুষের ভিড়ে। পরে, গেটের পাশে অফিসারদের সঙ্গে দাঁড়াই, কিন্তু চোরকে চিনতে পারিনি।'

রবিন পাতাগুলো উল্টে গেল। বইতে অনেক সই। শেষ নামটা অসম্পূর্ণ।

'আমি সই দিচ্ছি, এমন সময় নেকলেস ধরে টান দেয়।' বললেন ডেবি।

রবিন বইটা ফিরিয়ে দিতে গেল।

'ওটা আমার দরকার নেই।' বললেন ডেবি, 'কোনো ট্র্যাশ ক্যানে ফেলে দিয়ো!'

উঠে দাঁড়ালেন ডেবি।

'তোমরা দেখা করতে এসেছ বলে ধন্যবাদ।' বললেন। রবিনের সঙ্গে করে আনা ছবিটা লক্ষ করলেন তিনি, 'তোমাদেরও ও রকম লাগবে?' কিশোর আর মুসাকে প্রশ্ন করলেন। এই প্রথম মৃদু হাসি দেখা গেল মুসার মুখে।

'অবশ্যই!' বলে উঠল ও।

আরও দুটো ছবি সই করে কিশোর আর মুসাকে দিলেন ডেবি।

ছেলেরা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। হোটেলের বাইরে এক ট্র্যাশ ক্যান খুঁজে পেল ওরা।

'বইটা ফেলে দেবে নাকি?' রবিনকে জিজ্ঞাসা করল কিশোর।

'পাগল!' বলল নথি।

বেঞ্চিতে বসে গ্রিনহিলসের পরের বাসটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। রবিন সইগুলো দেখছিল, এমন সময় কিশোর ওকে আর মুসাকে আলতো কনুই মারল।

'দেখো এদিকে কে আসছে!'

ডেবি গিবসনের ম্যানেজার হ্যান্স ওদের দিকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। চোখে সানগ্লাস। সাইডওয়াক ধরে গটগট করে হাঁটছে, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাস্তার দুপাশ দেখছে।

'ও কি আমাদের পিছে লেগেছে?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল মুসা।

'মনে হয় না আমাদের দেখেছে।' বলল রবিন।

হঠাৎই এক দোকানের জানালার সামনে থমকে দাঁড়াল হ্যান্স। কাচ ভেদ করে উঁকি দিল, তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

জানালার একটা সাইন বলছে: ইয়ে ওল্ড জুয়েলারি শপ। উই বাই অ্যান্ড সেল আনইউজুয়াল আইটেমস।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'ডেবির ম্যানেজারই হয়তো চোর। ও হয়তো এখন পেঙ্গুইন নেকলেসটা বিক্রি করছে!'

'যে এলাকা থেকে চুরি করেছে, সেখানেই বিক্রি করার মতো বোকামি করবে না।' বলল কিশোর।

'হয়তো অতিরিক্ত চালাক।' বলল রবিন, 'কেউ সন্দেহ করবে না জেনেই হয়তো এখানে বিক্রি করছে! হ্যান্স চোরকে ঠেকাল না কেন, কাল থেকে তা-ই ভাবছি। মঞ্চের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল না ও?'

'ভালো প্রশ্ন।' বলল মুসা, 'আমরা কি ওকে ফলো করে দোকানে ঢুকব?'

'দরকার নেই।' বলল কিশোর, 'ও যদি ওখানে নেকলেসটা বিক্রি করতে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের দেখলে আর করবে না। তা ছাড়া বুঝে যাবে যে আমরা ওকে সন্দেহ করছি।'

'তাহলে কী করব আমরা?' প্রশ্ন করল মুসা।

'জানি না।' বলল কিশোর, 'গয়নার দোকানে ঢুকেছে বলেই হ্যান্সকে দোষী ভাবা যায় না। এবং আমার দেখা সেই মহিলা আর হট ডগওয়ালাকেও অপরাধী মনে করা ঠিক হবে না। চোর মুখোশ পরে ছিল এবং কোনো ক্লু রেখে যায়নি!'

'শুধু এটা।' রবিন বলতে না বলতেই ওদের বাস এসে গেল। লাল অটোগ্রাফ বইটা তুলে ধরল ও।

আধা ঘণ্টা বাদে, ছেলেরা ফিরে এল কিশোরের রুমে। কিশোর বাঘাকে খাওয়াচ্ছে, সেই ফাঁকে অটোগ্রাফ বইটার বাকি পাতাগুলো পড়ে ফেলল রবিন।

মুসা কিশোরের জিনিসপত্রে তল্লাশি চালিয়ে ক্যান্ডি খুঁজছে।

'অ্যাই, এটা কী?' জিজ্ঞাসা করে, কিশোরের স্যুভেনির এক্স-রেটা উঁচিয়ে দেখাল।

'কাল ডাক্তার যে দুটো এক্স-রে নিয়েছিল, তার একটা।' কিশোর জানাল।

'এত বড় একটা X চিহ্ন কেন?' প্রশ্ন করল মুসা।

কিশোর ব্যাখ্যা করল যে ব্যান্ডেজের জন্য ঝাপসা এসেছিল এক্স-রেটা।

'ব্যান্ডেজ খুলে আরেকটা এক্স-রে নিয়েছিল।' বলল ও।

'আরে, দেখো দেখো!' হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল

রবিন। অটোগ্রাফ বইটার ইনসাইড ব্যাক কভার খুলেছে, 'শোনো—জর্জিকে রুবি বেস্ট খালার উপহার, বড়দিন, ১৯৮০'।

'চোরের নাম জর্জি?' মুসা প্রশ্ন করল। কিশোরের এক্স-রেটা জানালার কাছে তুলে ধরেছে।

'তার মানে জানা গেল হট ডগওয়ালা চোর নয়।' বলল কিশোর, 'তার নাম ফ্র্যাঙ্ক।'

'কীভাবে জানলে?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'ওর জ্যাকেটের পকেটে নামটা সেলাই করা ছিল।' জবাবে বলল কিশোর।

'কিন্তু জর্জি হয়তো নেকলেস চুরির সময় ফ্র্যাঙ্কের জ্যাকেট পরে ছিল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'মুসা ঠিক বলেছে।' বলল রবিন, 'কিংবা এই বই হয়তো সেই মহিলার। জর্জি হয়তো তারই নাম।'

'খাইছে, হতে পারে।' বলল মুসা।

কিশোর মুখ তুলে দেখল যে এক্স-রে থেকে লাল রঙের কিছু একটা মুছছে মুসা।

'মুসা, কী করছ?' কিশোর প্রশ্ন করল, 'এক্স-রেটা নষ্ট কোরো না।'

'নষ্ট করছি না।' বলল মুসা, 'লাল রংটা আমার আঙুলে উঠে আসছে।'

মুসা টি-শার্ট দিয়ে ঘষে বাকি রংটুকু মুছে দিল।

'দেখো।' বলল ও।

X- এর লাইন দুটো যেখানে পরস্পরকে অতিক্রম করেছে, সেখানে তিন গোয়েন্দা এখন অদ্ভুত এক আকৃতি দেখতে পেল। জিনিসটা দেখতে অনেকটা ঝাপসা একটা ডিম কিংবা নাশপাতির মতন।

'কী এটা?' রবিন বলে উঠল।

'জানি না।' বলল কিশোর, 'তবে জিনিসটা যা-ই হোক, ডাক্তার এটাকে X চিহ্ন দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।'

নয়

ছেলেরা এক্স-রেটা জানালার কাছে ধরে অদ্ভুত আকৃতিটাকে সব কোনা থেকে খুঁটিয়ে পরখ করল।

রবিন আকৃতিটার চারপাশে আঙুল বোলাল।

'কেমন চেনা চেনা লাগছে... আরি!' সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কিশোর, সকালের পেপারটা নিয়ে এসো তো!'

কিশোর দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আধা মিনিট পর কাগজটা নিয়ে ফিরে এল।

রবিন ডেবি গিবসনের ছবি এবং হারানো নেকলেসটার ড্রয়িং খুঁজে বের করল।

'আমার ধারণা যদি ঠিক হয়... ।'

নেকলেসটার ড্রয়িং কিশোরের জানালার কাচের কাছে ধরল রবিন। এবার এক্স-রেটা খবরের কাগজের পাতাটার ওপর রাখল। যে অদ্ভুত আকৃতিটা ওরা চেনার চেষ্টা করছিল, সেটা অদ্ভুতভাবে নেকলেসটার সঙ্গে মিলে গেল। ড্রয়িংটা এক্স-রের আকৃতিটার চাইতে সামান্য বড়, কিন্তু জিনিস একই।

'ঝাপসা শেপটা পেঙ্গুইন!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'ঠিক ডেবি গিবসনেরটার মতো!'

'বুঝতে পারছি না।' বলল কিশোর, 'ডেবির নেকলেস এক্স-রেতে এল কীভাবে?'

মুসা একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে।

'তুমিই বলো।' বলল ও, 'কারণ এক্স-রের হাতটা তোমার।'

'কিশোর, ফার্স্ট এইড টেন্টে কী ঘটেছিল?' রবিনের প্রশ্ন, 'ডাক্তার কী করেছিল?'

কিশোর গতকাল সকালের কথা মনে করার চেষ্টা করল।

'ডাক্তার আমার হাত মুড়ে দেয়, তারপর নিয়ে যায়... না! দাঁড়াও! ব্যান্ডেজ করার সময় তাঁবুর দেয়ালে টেপ দিয়ে সাঁটা একটা সাইন পড়তে বলে!' বলল ও।

বন্ধুদের দিকে চাইল কিশোর।

'বলেছিল মাথায় চোট লাগেনি শিওর হওয়ার জন্য সাইনটা পড়াচ্ছে।' বলে চলল ও, 'কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তার নেকলেসটা চুরি করেছিল! ব্যান্ডেজের ভেতর ওটা লুকিয়ে রাখার সময় আমাকে পড়তে বলে, আমি যেন দেখতে না পাই সে কী করছে!'

'কিন্তু সে তোমার ব্যান্ডেজের ভেতর ওটা রাখবে কেন?' মুসা জবাব চাইল।

'আমি বলছি।' বলল রবিন, 'পুলিশ তল্লাশি করবে ও জানত, তাই লুকিয়ে রাখে। এভাবে কিশোরকে দিয়ে নেকলেসটা পার্ক থেকে বের করে নিয়ে যায়।'

কিশোর মাথা ঝাঁকাল। রক্ত চলাচলের গতি দ্রুততর হয়েছে ওর।

'তারপর আমাকে এক্স-রে অফিসে নিয়ে গিয়ে, ব্যান্ডেজ খুলে নেকলেসটা বের করে নেয়।'

'কিন্তু তোমার তো দেখতে পাওয়ার কথা।' বলল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর।

'কী বুদ্ধু আমি!' বলল, 'ও ব্যান্ডেজ খোলার সময় আমাকে দিয়ে আরেকটা সাইন পড়িয়ে নেয়! হাতের দিকে তাকাইনি আমি!'

'তো হট ডগওয়ালা চোর নয়।' বলল মুসা, 'কিংবা সেই মহিলা অথবা হ্যান্স। চোর হচ্ছে তোমার ডাক্তার!'

'ওকে কীভাবে খুঁজে বের করব আমরা?' রবিনের প্রশ্ন।

'ওর নাম ড. ফ্লেমিং।' নেম ট্যাগ মনে পড়ল কিশোরের।

'জর্জি ফ্লেমিং।' বলে অটোগ্রাফ বইয়ের দিকে চাইল মুসা।

'চলো, হার্টফোর্ড হাসপাতালে ফোন করি।' প্রস্তাব করল রবিন, 'কজন জর্জি ফ্লেমিংই বা থাকবে?'

হলওয়ের টেলিফোনের কাছে চলে এল ওরা। রবিন হাসপাতালের নম্বর নিয়ে ফোন করল। ড. জর্জি ফ্লেমিং নামে তাদের কোনো স্টাফ নেই। এমনকি জর্জেট, জর্জিনা কিংবা জর্জিয়াও নেই। মি. ফ্লেমিংয়ের অস্তিত্বই পাওয়া গেল না।

তবে ড. রিচার্ড ফ্লেমিং নামে একজনের খোঁজ পাওয়া গেল।

'আমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?' প্রশ্ন করল রবিন। এক মিনিট পর, ড. রিচার্ড ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে কথা বলল ও।

তাঁকে দুটো প্রশ্ন করল নথি : গতকাল কি তিনি বুশনেল পার্কের ফার্স্ট এইড তাঁবুতে কাজ করেছেন? জর্জি ফ্লেমিং নামে কাউকে কি তিনি চেনেন?

রিসিভার রেখে দিল রবিন।

'ওঁর ঠান্ডা লেগেছিল, কালকে বাসায় ছিলেন।' জানাল, 'আর তিনি জর্জি ফ্লেমিং নামে কাউকে চেনেন না।'

'খাইছে, তাহলে কালকে তাঁবুতে যে ড. ফ্লেমিং ছিল, তাকে আমরা খুঁজে পাব কীভাবে?' বলল মুসা।

'ড. রিচার্ড ফ্লেমিং আমাকে অন্য একটা কথা বলেছেন।' রহস্যপূর্ণ হেসে বলল রবিন, 'কালকে কে যেন

তাঁর সাদা জ্যাকেটটা চুরি করে। একেবারে তাঁর অফিস থেকে!'

কিশোর আর মুসা ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

'তাঁর নেম ট্যাগসহ।' যোগ করল রবিন।

'তাহলে...তাহলে তাঁবুর লোকটা যদি ড. ফ্লেমিং না হয়, তবে কে সে?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'ও হলো জর্জি, চোরা জর্জি!' বলল মুসা।

'কিন্তু লোকটা ডাক্তারি জানে।' বলল কিশোর, 'আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে হাতের এক্স-রে করেছে।'

'ও হয়তো ডাক্তার, তবে ড. ফ্লেমিং নয়।' বাতলে দিল নথি।

'তাহলে অন্য ডাক্তারের জ্যাকেট আর নেম ট্যাগ চুরি করল কেন সে?' কিশোর জবাব চাইল।

'হিরেটা চুরির মতলব থেকে থাকলে,' বলল মুসা, 'নিজের নাম জানাতে চাইবে কেন?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'কথা ঠিক। কিন্তু কে ও? থাকে কোথায়?'

'জর্জি হার্টফোর্ড হাসপাতালের অলিগলি চেনে।' বলল মুসা, 'ও হয়তো হার্টফোর্ডেই থাকে।' অটোগ্রাফ বইটার দিকে আঙুল নির্দেশ করল, 'আর ও যদি হার্টফোর্ডে থেকে থাকে, তাহলে ওর রুবি খালাও মনে হয় থাকে!'

মুসা রিসিভার তুলে নিয়ে ইনফরমেশনে ডায়াল করল। আর. বেস্টের নম্বর পেয়ে ফোন করল।

এক মহিলা জবাব দিলে মুসা জানতে চাইল ও রুবি বেস্টের সঙ্গে কথা বলছে কি না।

মহিলা যখন জানাল, 'হ্যাঁ', তখন ও বলল জর্জির এক অটোগ্রাফ বই খুঁজে পেয়েছে, যাতে রুবি বেস্টের নাম আছে।

'জর্জির নাম-ঠিকানা দিলে বইটা ওর কাছে পাঠিয়ে দিতাম।' বলল মুসা।

জর্জির খালার কাছ থেকে নাম-ঠিকানা পেয়ে মুসা রিসিভার রেখে দিল।

'ওর নাম জর্জ হ্যারিস।' কিশোর আর রবিনকে বলল, 'হার্টফোর্ডের লরেল স্ট্রিটে থাকে।'

দশ

'আমরা তো খামাখা ওর বাসায় গিয়ে হাজির হতে পারি না।' বলল মুসা, 'ও পুরো ব্যাপারটাই অস্বীকার করবে।'

'কিন্তু আমাদের কাছে এই এক্স-রে প্রমাণটা রয়েছে।' বলল কিশোর, 'আর অটোগ্রাফ বইটা।'

'মাটিতে নামো, কিশোর। আমরা ছোট আর ও বড় মানুষ।' বলল মুসা, 'আমাদের স্রেফ হাঁকিয়ে দেবে।'

'একজনকে হাঁকিয়ে দিতে পারবে না।' বলে রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল রবিন।

২০ মিনিট পর কিশোরদের লিভিংরুমে বসে থাকতে দেখা গেল অফিসার ফলেটকে।

ছেলেরা তাঁকে পুরো ঘটনা খুলে বলল।

'আমাকে ফোন করে ভালো করেছ।' অফিসার ফলেট বললেন, 'জর্জ হ্যারিসের কাছে এখনো হয়তো নেকলেসটা রয়েছে। ওটা সরানোর জন্য তেমন সময় পায়নি।'

হার্টফোর্ড পুলিশ চিআবার কাছে ফোন করলেন তিনি। ৪৫ মিনিট পর জর্জির বাসায় তাঁরা মিলিত হবেন সিদ্ধান্ত নিলেন।

'কিশোর, লোকটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য তোমার যাওয়া দরকার।' বললেন অফিসার ফলেট, 'তোমার গার্জেনরা বাসায় আছেন তো?'

'বাইরে গেছে।' বলল কিশোর, 'তবে আমি একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেব আপনার সঙ্গে বেরিয়েছি।'

মুসা আর রবিনের দিকে চাইল কিশোর।

'ওরা সঙ্গে যেতে পারে? রহস্যটা কিন্তু ওরাই সলভ করেছে।' বলল।

হাসলেন অফিসার ফলেট।

'শিওর, আমরা সবাই যাব।' বললেন, 'আমি দল ভাঙতে চাই না!'

অফিসার ফলেট যখন লরেল স্ট্রিটের কোনায় গাড়ি থামালেন, তখন হার্টফোর্ড পুলিশের দুটো ক্রুজার অপেক্ষা করছিল।

ছেলেদের পেছনের সিটে বসিয়ে রেখে হার্টফোর্ডের অফিসারদের সঙ্গে কথা বললেন অফিসার ফলেট।

'তুমি রেডি, কিশোর?' নিজের ক্রুজারে ফিরে এসে জানতে চাইলেন অফিসার ফলেট।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

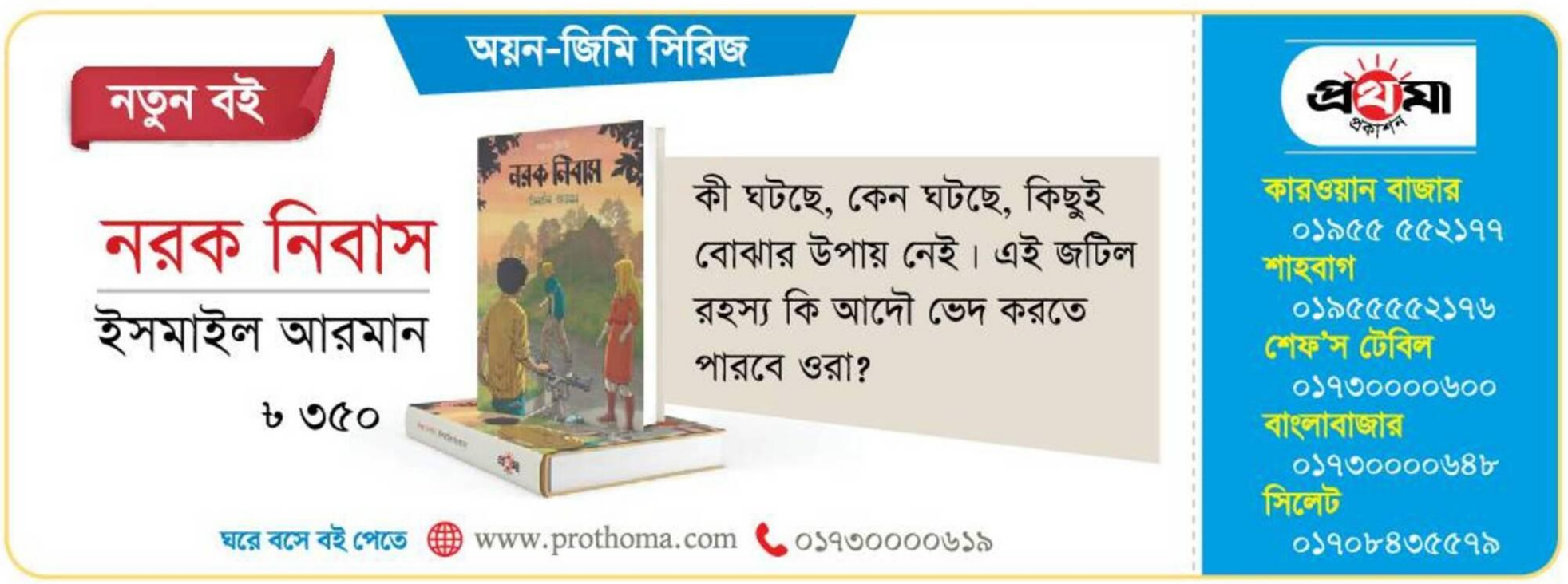
'চলো যাওয়া যাক।' অফিসার ফলেট বললেন, 'পুলিশ চারদিক ঘিরে রেখেছে। ও পালাতে পারবে না।'

অফিসার ফলেট ধীরগতিতে গাড়ি চালিয়ে ১৩ নম্বরের সামনে থামলেন। বাড়িটা পুরোনো। ইটের তৈরি। একটা শাটার বাঁকা হয়ে ঝুলছে। লন আগাছায় ভরা। সব কটা শেড টেনে নামানো।

অফিসার ফলেট আর কিশোর দরজার কাছে হেঁটে গেল। কিশোরের হাতে এক্স-রে ভরা খামটা।

দরজায় সাড়া দিয়ে যে লোকটি উদয় হলো, তার পরনে জিনস আর টি-শার্ট। খালি পা। ডোনাট খাচ্ছে। তবে কিশোর ওকে চিনতে পারল। এই সেই 'ডাক্তার' যে গতকাল ফার্স্ট এইড তাঁবুতে ছিল।

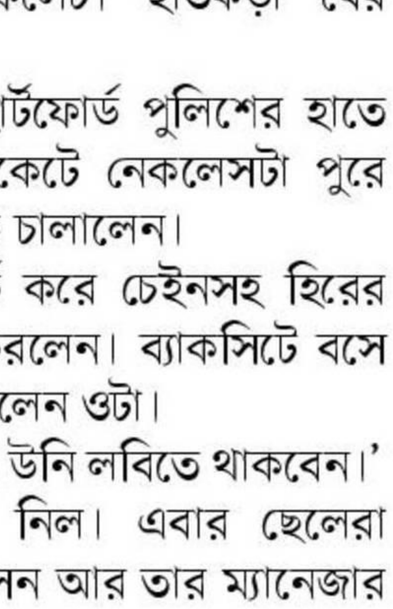
'ইনিই।' ফিসফিস করে বলল কিশোর।



‘আপনিই মি. হ্যারিস?’ অফিসার ফলেট বললেন।
নার্ভাস ভঙ্গিতে ঢোঁক গিলল জর্জ হ্যারিস।
‘কী...কে...?’
অফিসার ফলেট অটোগ্রাফ বইটা এগিয়ে দিলেন।
‘এটা আপনার?’
বইটার দিকে চাইল জর্জি।
‘আমার...আমার তা-ই মনে হচ্ছে। কোথায় পেলেন?’
‘ডেবি গিবসনের কাছে ছিল।’ অফিসার ফলেট বললেন, ‘তিনি গতকাল এটায় অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন, এ সময় আপনি তাঁর হিরের নেকলেসটা ছিনতাই করেন। তারপর ওটা এই ছেলের ব্যান্ডেজের ভেতর লুকান, যাতে পুলিশদের চোখ এড়িয়ে নিশ্চিন্তে বুশনেল পার্ক থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। হাসপাতালে এক্স-রে নেওয়ার সময় নেকলেসটা সরিয়ে ফেলেন।’
জর্জ হ্যারিসের হাত থেকে আরেকটু হলে ডোনাটটা খসে পড়ত। তার মুখ হাঁ এবং বন্ধ হলো, কিন্তু কোনো শব্দ বেরোল না।
‘কিছু বলার আছে, মি. হ্যারিস? নাকি আপনাকে ড. ফ্লেমিং বলে ডাকব?’ অফিসার ফলেট বললেন, ‘এটা হয়তো আপনার মুখে কথা ফোটাবে।’
কিশোরের উদ্দেশে মাথা নাড়লেন তিনি। কিশোর এক্স-রেটা তুলে ধরল।
‘মি. হ্যারিস, আপনার বাড়ি তল্লাশি করলে কি মিস গিবসনের নেকলেসটা পাব?’ অফিসার ফলেটের প্রশ্ন, ‘আর ড. ফ্লেমিংয়ের অফিস থেকে আপনার চুরি করা জ্যাকেটটা?’
কথা ফিরে পেল জর্জি।
‘আমি-আমি সব ব্যাখ্যা করতে পারব।’ তুতলে বলল।
‘জানি পারবেন, কিন্তু সেটা নাহয় থানায় গিয়েই দেবেন।’ বললেন অফিসার ফলেট। হাতকড়া বের করলেন।
অফিসার ফলেট জর্জিকে হার্টফোর্ড পুলিশের হাতে তুলে দিলেন। এবার শার্টের পকেটে নেকলেসটা পুরে পার্কভিউ হোটেলের উদ্দেশে গাড়ি চালালেন।
অফিসার ফলেট গাড়ি পার্ক করে চেইনসহ হিরের নেকলেসটা পকেট থেকে বের করলেন। ব্যাকসিটে বসে থাকা ছেলেদের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন ওটা।
‘আমি আগেই ফোন করেছি। উনি লবিতে থাকবেন।’
গোয়েন্দাপ্রধান নেকলেসটা নিল। এবার ছেলেরা লবিতে প্রবেশ করল। ডেবি গিবসন আর তার ম্যানেজার একসঙ্গে বসে ছিলেন।
‘নাও, ওঁর হাতে এটা দাও।’ বলে রবিনের হাতে নেকলেসটা তুলে দিল কিশোর, ‘অটোগ্রাফ বইতে তুমিই জর্জির নাম খুঁজে পেয়েছিলে।’
রবিন নেকলেসটা নিয়ে মুসার হাতে দিল।
‘তুমি জর্জিকে খুঁজে বের করার উপায় বের করেছ।’ বলল ও, ‘যাও, ডেবি অপেক্ষা করছে।’
ডেবি আর হ্যান্স উঠে দাঁড়িয়ে ওদের উদ্দেশে হাসলেন।
‘তোমাদের অনেক ধন্যবাদ!’ বললেন ডেবি, ‘কীভাবে পেলে?’
‘অটোগ্রাফ বইটার ভেতর একটা নাম পাই আমরা।’ ব্যাখ্যা করল রবিন। গোটা ঘটনাটা খুলে বলল ওরা। কিশোর ডেবিকে এক্স-রেটা দেখাল।
অফিসার ফলেট টেলিফোনে কথা বলছিলেন। কথা শেষে সামনে এগিয়ে এলেন।
‘জর্জি হ্যারিসকে পরীক্ষায় নকল করার দায়ে মেডিকেল স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়।’ বললেন, ‘ওর আরও নানান কীর্তি আছে। যাক গে, মিস গিবসন, ও কাগজে আপনার কনসার্টের কথা পড়ে ঠিক করে ওখানে যাবে। অটোগ্রাফ বইটা ব্যবহার করে আপনার কাছে যায়, নেকলেসটা যাতে চুরি করতে পারে।’
ডেবি নেকলেসটা হ্যান্সের হাতে দিলেন। সে ওটা পরিয়ে দিল তাঁর গলায়।
‘জর্জি ফার্স্ট এইড টেন্টে গিয়ে ডিউটিতে থাকা মেডিকেল স্টুডেন্টকে বলে, তাকে হাসপাতালে ডেকে পাঠানো হয়েছে।’ অফিসার ফলেট বলে চললেন, ‘জর্জির গায়ে ড. ফ্লেমিংয়ের চুরি যাওয়া জ্যাকেট আর নেম ট্যাগ ছিল, তাই ছেলেটি ওর কথা বিশ্বাস করে। তার পর থেকে জর্জি আপনার অনুষ্ঠানের বিরতির অপেক্ষায় বসে ছিল।’
মৃদু হাসলেন ডেবি।
‘নেকলেসটার দাম আমার কাছে অনেক।’ বললেন তিনি, ‘হ্যান্স এটা আমাকে বিয়ের সময় গিফট দিয়েছিল।’
মুসা অবাক দৃষ্টিতে বিশালদেহী, ক্রুদ্ধ চেহারার ম্যানেজারের দিকে চেয়ে রইল।
‘খাইছে! উনি আপনার স্বামী?’ প্রশ্ন করল, ‘আমরা ওঁকে একটা জুয়েলারির দোকানে ঢুকতে দেখেছিলাম। ওঁর হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, উনিও চোর হতে পারেন!’
ডেবি স্বামীর দিকে তাকালেন।
‘কী, তুমি জুয়েলারির দোকানে গিয়েছিলে কেন?’
হাসল হ্যান্স।
‘আমি তোমার জন্য আরেকটা পেঙ্গুইন নেকলেস কিনতে চাইছিলাম।’ বলল সে।
হাসলেন ডেবি। তারপর একে একে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন কিশোর, রবিন আর মুসার।

অলংকরণ : **আরাফাত করিম**

দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি
আদনান মুকিত
৩য় মুদ্রণ। ৳ ৪২৫

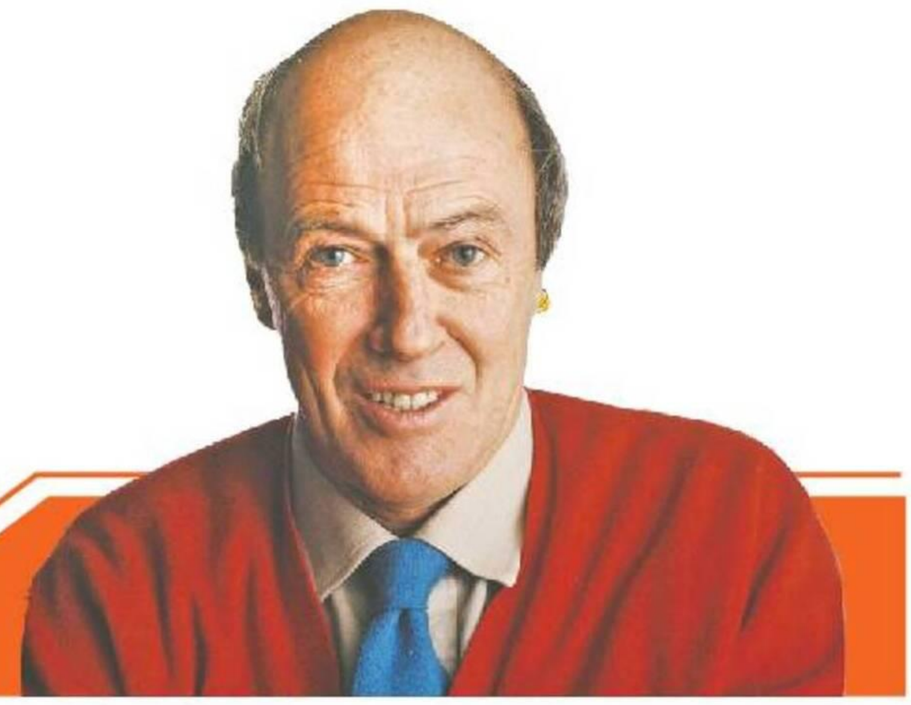


ইভান বুঝতে পারল কেউ একজন ফাঁসাতে চাচ্ছে ওকে। কিন্তু কে? কেন শুধু শুধু বিপদে ফেলতে চাইবে ইভানকে? আর এই নতুন মেয়েটাই-বা কে? এই ঘটনার সঙ্গে ওর কি কোনো সম্পর্ক আছে?

প্রথমা প্রকাশন
কারওয়ান বাজার ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭
শাহবাগ ০১৯৫৫৫৫২১৭৬
শেফ'স টেবিল ০১৭৩০০০০৬০০
বাংলাবাজার ০১৭৩০০০০৬৪৮
সিলেট ০১৭০৮৪৩৫৫৭৯

ঘরে বসে বই পেতে www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯

রোয়াল্ড ডালের ছোট্ট ঘর



ছোটদের প্রখ্যাত লেখক রোয়াল্ড ডাল কখনোই কোনো বিশাল লাইব্রেরিতে বা বড় অফিসঘরে বসে লিখতেন না, তিনি লিখতেন বাগানের এক কোণে বানানো একটা ছোট্ট কুটিরে, যেখানে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে পারত না!

কুটিরের ভেতরে তিনি বসতেন এক পুরোনো আর্মচেয়ারে, পায়ে জড়ানো থাকত কম্বল, কোলে থাকত কাঠের বোর্ড। আর সেই বোর্ডের ওপরে সব সময় থাকত হলুদ রঙের কাগজ! ডালের বিশ্বাস ছিল, উজ্জ্বল রং লেখালেখির অভিজ্ঞতাকে আনন্দময় করে তোলে।

সেই ছোট্ট কুটিরের ভেতর বসেই ডাল লিখেছিলেন নিজের অধিকাংশ বিখ্যাত বই। সেখানেই জন্ম নিয়েছিল *চার্লি অ্যান্ড দ্য চকলেট ফ্যাক্টরি*, *মাটিল্ডার* মতো ভুবন বিখ্যাত কাহিনি। বাইরে থেকে দেখতে ছোট্ট সেই কুঁড়েঘরটির ভেতরে ছিল সীমাহীন কল্পনার এক বিশাল ভুবন! ঠিক যেন ম্যাজিক, রোয়াল্ড ডালের বইগুলোরই মতো।

দুবাইয়ের বিশাল বইঘর

দুবাইতে আছে এমন এক লাইব্রেরি, যেটা দেখতে বিশাল একটি খোলা বইয়ের মতো! 'মোহাম্মদ বিন রশিদ লাইব্রেরি' নামের এই দালান বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন ফ্যান্টাসির জগৎ থেকে তুলে নিয়ে আসা একটি স্থাপনা।

লাইব্রেরির ভেতরে ঢুকলেই অপেক্ষা করছে লাখো বই, সাততলাজুড়ে সাজানো। আর সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, বই পড়ার জন্য সাহায্য করতে এখানে আছে রোবট! পাঠকের অনুরোধে তারা মুহূর্তেই তাক থেকে বই এনে হাজির করে দিচ্ছে পড়ার জন্য। লাইব্রেরি নয়, এ যেন এক স্বপ্নপুরী—যেখানে বইয়ের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে রোবট।



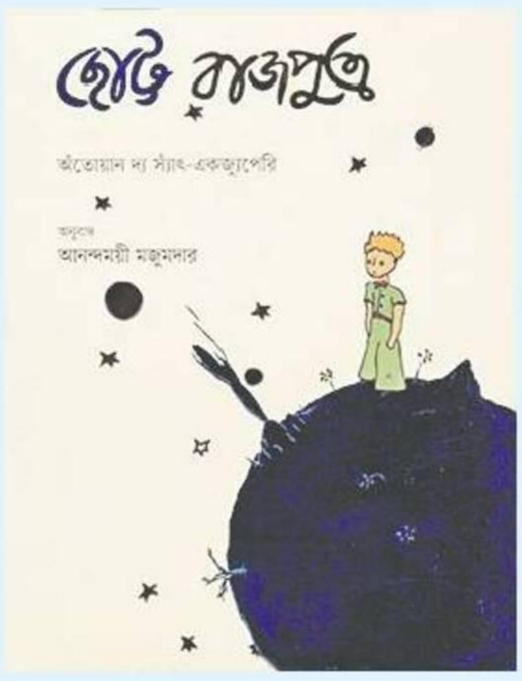
এই মাসে

৬ সেপ্টেম্বর : ন্যাশনাল রিড আ বুক ডে

যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হলেও আজ বিশ্বজুড়ে বইপ্রেমীরা এই দিনটি পালন করে সব বয়সের সব মানুষকে একটা বই হাতে তুলে নিতে উৎসাহ দিতে। বই শেষ না করলেও সমস্যা নেই—শুরু করাটাই আসল। কয়েক পাতা পড়লেও তা আমাদের আনন্দ, মনোযোগ আর কল্পনাশক্তি বাড়াবে। এই দিনে সবাইকে বই পড়ানোর জন্যই তাই এমন দিবস।

বইপত্রের হরেক খবর

দ্য লিটল প্রিন্স অনূদিত হয়েছে পাঁচ শতাধিক ভাষায়। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশিবার অনূদিত শিশুসাহিত্য।



সবচেয়ে দ্রুত বিক্রি হওয়া বইটি হলো হ্যারি পটার সিরিজের শেষ বই (*ডেথলি হ্যালোজ*)। প্রকাশের প্রথম ২৪ ঘণ্টায় বিক্রি হয়েছিল ১ দশমিক ১ কোটি কপি।

অ্যালিস'স অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড-এর একটি বিশেষ সংস্করণ ছাপা হয়েছিল...চকলেট দিয়ে!

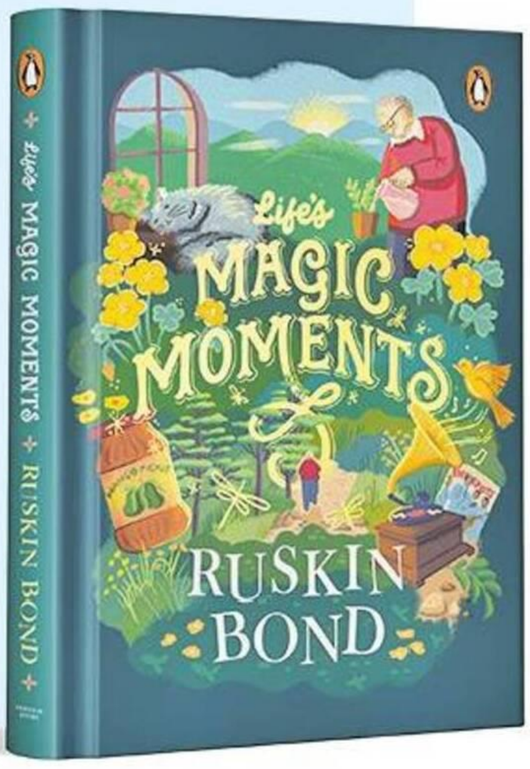
অ্যাপোলো মিশনে মহাকাশচারীরাও সঙ্গে বই নিয়েছিলেন! মহাকাশে তাঁদের সঙ্গে ছিল 'বাইবেল' আর *দ্য লিটল প্রিন্স*।

'শুধু হৃদয় দিয়েই মানুষ সঠিকভাবে দেখতে পারে; যেসব ব্যাপার সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ, তা চোখে ধরা পড়ে না।'

— আঁতোয়ান দ্য সাঁত-একজুপেরি, দ্য লিটল প্রিন্স

নতুন বই

১৯৩৪ সালে জন্ম নেওয়া প্রখ্যাত লেখক রাস্কিন বন্ড এ বছর উদ্‌যাপন করলেন তাঁর ৯১তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে পেঙ্গুইন বুকস থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নতুন বই Life's Magic Moments—যেখানে শৈশব থেকে বার্ধক্য, প্রকৃতি, স্বপ্ন আর জীবনের ছোট ছোট সুখের কথা উঠে এসেছে সরল অথচ গভীর ভাষায়।



গ্রন্থনা : **মুহাম্মদ আহসান নাহিয়ান**



খাইবার আগে

নিয়াজ মেহেদী

ট্রাকটা চলছিল অনেকক্ষণ ধরে। পিঠে পাথর বোঝাই বলে চওড়া মসৃণ রাস্তায়ও চালাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল রশিদ ড্রাইভারের। এমনিতে সে খুব হাসিখুশি মানুষ। ঠাট্টা-মশকরা করে অপরিচিত মানুষের সঙ্গেও দিব্যি আড্ডা জমিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু স্টিয়ারিংয়ে হাত দিলে সেই লোকই বদলে যায়। একটার পর একটা পান চিবোতে থাকে আর শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। ক্লাচ ও এক্সেলেটরে দুই পা দিয়ে, কাঁপতে থাকা গিয়ারটা বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে সে যেন দরবেশের মতো ধ্যানে বসে। তখন চিরচেনা রশিদ ড্রাইভারকে ভীষণ ভয় পায় সানোয়ার।

অনেকক্ষণ ধরে সানোয়ারের খিদে পেয়েছে। তার ওপর বাথরুম পেয়েছে। পেটে একই সঙ্গে শূন্যতা ও পূর্ণতার অদ্ভুত বুদ্‌বুদ নিয়ে ভীষণ অস্বস্তিতে আছে কিশোর সানোয়ার। কিন্তু রশিদ ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকিয়ে থামতে বলার সাহস পাচ্ছে না।

রশিদের সব মনোযোগ এখন রাস্তার দিকে। আড়চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চোয়াল নেড়ে পান চিবোচ্ছে। চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল। জুলফি ও গোঁফ থেকে ধীরে ধীরে ঘাম গড়াচ্ছে। তারপরও রশিদ নির্বিকার। সানোয়ার আর থাকতে



না পেরে একটা গান চালিয়ে দেয়। এশার আজানের সময় এমপি-থ্রি প্লেয়ার বন্ধ করা হয়েছে। এরপর পেরিয়ে গেছে আরও চার ঘণ্টা। এর মধ্যে রশিদ একটা কথাও বলেনি। সানোয়ারের ভয় হলো, আষাঢ়ের গরমে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো!

মেহেদী হাসানের একটা গজল শুরু হতেই রশিদ যেন চমকে উঠল। সে সানোয়ারের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলল, 'কিরে ব্যাটা, খিদা পাইছে?'

এইবার সানোয়ার মুখ ফুটে বলল, 'খিদা পাইছে, খালু। আপনি খাইবেন না?'

রশিদ বাইরে তাকিয়ে কোনো মাইলপোস্ট খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোন জায়গা?'

সানোয়ার এদিকে কখনো আসেনি। সে মাথা নেড়ে বলল, 'কইতে পারি না।'

রশিদ বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী কইতে পারস তাইলে? তুই গুঙ্গা? নাকি আন্ধা? খাওয়ার কথা কইতে পারস না, রাস্তাঘাটের কথা কইতে পারস না। হেলপারের কামডা কী তাইলে?'

সানোয়ার অস্ফুট গলায় বলল, 'আমার ডর করে, খালু।'

রশিদ কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। বোধ হয় তার হেলপারি জীবনের কোনো স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। সে স্নেহভরা সুরে বলল, 'ডর করে ক্যান ব্যাটা? আমি আছি না?'

সানোয়ার সাহস পেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, 'সারা দেশের মানুষ তেঁতুলিয়া থাইকা পাথর নিয়া যায়। আর আমরা পাথর নিয়া তেঁতুলিয়ায় যাইতেছি। আপনার মনে একবারও প্রশ্ন উঠে নাই যে আমাগো ট্রাকে ঠিক কী তুইলা দিল?'

খটকা রশিদেরও লেগেছে। কিশোর হেলপারের চিন্তায় সে চমৎকৃত হয়ে বলল, 'তুই এই সবও ভাবিস?'

সানোয়ার ধীরে ধীরে বলল, 'ভাবি। কিন্তু সব সময় কইতে পারি না।'

রশিদের মধ্যে আড্ডার মেজাজ ফিরে আসতে শুরু করেছে। সে একটা শিস দিয়ে বলল, 'আমার লগে থাকলে কইতেও শিখবি। খালি কাজে-কামে মনোযোগ দে...'

কথাটা শেষ করার সুযোগ পেল না রশিদ। তার চোখে একটা ভাতের হোটেল পড়েছে। সে খুশি হয়ে বলল, 'ওই তো একটা হোটেল। ল যাইগা।'

হোটেলটা সানোয়ারেরও চোখে পড়েছে। সে ট্রাক থামানোর তীব্র ইচ্ছা উপেক্ষা করে বলল, 'কিন্তু হোটেলটা ওইখানে ক্যান? রাস্তার পাশে এত জায়গা থুইয়া হোটেলটা অত দূরে বানাইলো ক্যান?'

রশিদ এভাবে ভেবে দেখেনি। তারা অনেকক্ষণ ধরে বিরান হাইওয়ে ধরে চলছে। সর্বশেষ বাজার পার হওয়ারও পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে। পথের দুই পাশে বিস্তীর্ণ ঘাসে ভরা মাঠ আমন ধান রোপনের অপেক্ষায় পড়ে আছে। ত্রিসীমানায় লোক নেই, কিন্তু হোটেল আছে—এটা এখন আর হাইওয়েতে অস্বাভাবিক দৃশ্য নয়। ট্রাকচালকদের অপেক্ষায় হোটেলগুলো সারা রাত তীর্থের কাকের মতো বসে থাকে। কিন্তু এই হোটেল রাস্তার কোল ঘেঁষে নয়। হাইওয়ে থেকে পশ্চিমে বেরিয়ে যাওয়া একটা সরু রাস্তার ওপর মাটি ভরাট করে বানানো।

রশিদ মোড়ের ওপর ট্রাক দাঁড় করিয়ে বলল, 'এই রাস্তাটা আগে দেখছস? এত দিন এই রোডে গাড়ি চালাই, কখনো তো এই রাস্তা চোখে পড়ে নাই। এই পথে কই যায়, কে জানে?'

সানোয়ার ততক্ষণে ভাবছে, হোটেলে গিয়ে কী কী খাবে। সে বলল, 'লন, দেইখা আসি। আমার মন কইতাছে, এরা খানা পাকায় ভালা।'

হোটেলের নাম পুষ্টি ভোজনালয়। পুরোনো বাঁশ ও টিন দিয়ে বানানো নিতান্ত সাধারণ এক ভাতের হোটেল। উঠানে একটা বাতাবিলেবুর গাছ বড় বড় ফলের ভারে নুয়ে আছে। গাছের ডালে ঝিকিমিকি রুপালি বাতি জ্বলছে। তার ওপর দিব্যি বসে আছে একটা প্রকাণ্ড লক্ষ্মীপ্যাঁচা। এতক্ষণ উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। ট্রাকের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি এক শ আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে আগন্তুকদের দিকে তাকাল। সানোয়ারের মনে হলো, পশ্চিমের অন্ধকারে উড়ে যাওয়ার আগে প্যাঁচাটির চোখ জোড়া একবার দপ করে জ্বলে উঠল।

বাইরে যতই আলোকিত হোক, হোটেলের ভেতরে আলো খুব সামান্য। চল্লিশ ওয়াটের পুরোনো হলুদ বাতি মিটিমিটি জ্বলছে। রশিদ খুশি হয়ে বলল, 'এই হোটেলের মালিক ভাইরে ধন্যবাদ। ডেরাইভারের চোখের আরাম কইরা থুইছে। দুইন্যার সব হোটেলমালিকেরে যদি আল্লায়

এমন বুদ্ধি দিত!'

ভেতরে রেডিওতে মৃদু শব্দে গান বাজছে, 'দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা...।'

রশিদ বাথরুম থেকে ঘুরে এসে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি একটানে শেষ করে বলল, 'আহ, টিউবওয়েলের পানির মতো স্বাদের পানি আর হয় না। কিন্তু পানিতে খুব আয়রন। ওয়াশার পাল্টাইতে হবে। ম্যানেজার ভাই, কলের ওয়াশারডি পাল্টাইয়া নিয়েন।'

ম্যানেজার এই ঘোর গরমের দিনেও গায়ে-মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ছিল। সে রশিদের কথা শুনে 'ওহ!'-এর মতো একটা শব্দ করল। লোকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রশিদ বিড়বিড় করে বলল, 'কিরে সানোয়ার, কী খাইবি কইলি না?'

সানোয়ারের খেতে ইচ্ছা করছে কচুর লতি দিয়ে চিংড়ি, শিদলের ভর্তা, শুকনা মরিচ পুড়িয়ে বানানো পেঁয়াজের ভর্তা আর গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত। কিন্তু ইচ্ছা করলে কী হবে? এসব খাবার হোটেলে বিক্রি হয় না। সে জিবের জল সামলে বলল, 'গরুর মাংস আর ভাত।'

রশিদ তুড়ি মেরে বয়কে ডাক দিয়ে বলল, 'ওইটাই সই। গরুর মাংস আর ভাত নিয়া আসো। সাথে পাতলা ডাইল।'

'আবারও গরুর মাংস!' ভেবে সানোয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রশিদ ড্রাইভারের সঙ্গে যতবার খেতে বসেছে সে, ওই এক তরকারি দিয়ে ভাত খেতে হয়েছে। কখনো একচুল নড়চড় হয়নি। লোকটা আর কিছু খায় না নাকি?

বয় কিছুক্ষণের মধ্যে ভাতের গামলা, দুই বাটি মাংস আর এক জামবাটি ভর্তি ডাল এনে টেবিলে রাখল। মাংসের ছিরি দেখে রশিদ মুখ কুঁচকে বলল, 'ঠান্ডায় মাংস কেমন জইমা রইছে। গরম-গরম খাওয়াইতে পারো না?'

বয় দাঁত বের করে হাসল। সানোয়ার অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল। যেমন লম্বা, তেমনি শুকনা সে। মাথাভর্তি এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল কান পেরিয়েছে। সামনের চুল নেমে এসে চোখ জোড়া ঢেকে ফেলেছে দেখে সানোয়ারের মনে হলো, এই আলো-আঁধারির মধ্যে ছেলেটা হাঁটে কীভাবে? হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় না?

রশিদ কিন্তু হাসিতে গলার পাত্র নয়। সে জগের পানি মাংসের বাটিতে ঢালার উপক্রম করে বলল, 'এক্ষনি মাংস গরম কইরা নিয়া আসো। নাইলে এই পানি ঢাললাম। কুইক!'

বয় সানোয়ারের দিকে ফিরে বলল, 'আপনিও গরম খাবেন কি?'

অদ্ভুত ছেলেটার কণ্ঠস্বর। যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। সন্দেহ হতেই রশিদ হোটেলের ক্যাশের দিকে তাকাল। ম্যানেজার চাদরের ঘোমটা খুলে জুলজুলে দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বয় ও ম্যানেজারের চেহারা অবিকল একই রকম। তারা যেন দুই যমজ ভাই। না, তুলনাটা জুতসই হলো না। ম্যানেজারের চেহারায় বয়সের ছাপ আছে। তারা যেন পিতা-পুত্র।

রশিদ হড়বড় করে বলল, 'বাপে-পোলায় হোটেল খুলছেন ভালো কথা। কিন্তু পোলারে এলেমও তো দেওন লাগব, তা-ই না? গরম ভাতের হোটেলে ঠান্ডা গোশত খাইতে দেওয়া কি ঠিক?'

ম্যানেজারের অপলক দৃষ্টি একটুও ম্লান হলো না। সানোয়ারের মনে হলো, লোকটা একবারও চোখের পাতা ফেলছে না। কিছু কিছু মানুষ আছে এ রকম, যাদের চোখের পলক খুব কম পড়ে।

ম্যানেজার ইশারায় বয়কে মাংস গরম করে আনতে বলল। রশিদ থালায় ভাত বেড়ে ডাল মেখে খেতে শুরু করেছে দেখে সানোয়ারও ওস্তাদকে অনুসরণ করল। দিব্যি সুস্বাদু ডাল। ট্রাকের হেলপারি শুরু করার পর হোটেলে তিন বেলা খাওয়া তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, যেখানে ডাল ভালো রান্না হয়, সেখানকার তরকারিও সুস্বাদু হয়।

সানোয়ারের খুব খিদে পেয়েছে। শুধু ডাল দিয়েই সে গপাগপ খেতে শুরু করল। লক্ষও করল না যে রশিদ খাওয়া বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিরক্ত হয়ে রশিদ ছোট্ট করে একটা শিস দিল। সানোয়ার চমকে ওস্তাদের দিকে তাকাতেই সে হোটেলের ভেতরে ইশারা করল।

এতক্ষণ হোটেলে খদ্দের ছিল শুধু তারা দুজন। কোন ফাঁকে যেন হোটেলটি পূর্ণ হয়ে গেছে। তাদের বাঁ পাশের টেবিলে দুই কালো বোরকা পরা মহিলা একটা কমলা রঙের ফ্রক পরা মেয়েকে নিয়ে খেতে বসেছে। ডানের টেবিলে টি-শার্ট ও জিনসের প্যান্ট পরা দুই তরুণ খেতে খেতে উচ্চ স্বরে কী নিয়ে যেন তর্ক করছে। একটা টেবিলে বসেছে স্কুলড্রেস পরা দুটি শিশু। একটা ছেলে, আরেকটা মেয়ে। দুজনের বয়স ছয় বছরের বেশি হবে না। আরেক টেবিলে পাগড়ি পরা এক লম্বা দাড়িওয়ালা লোক তিনজন মাদ্রাসাপড়ুয়া তালিবুল এলেমকে নিয়ে রুটি-তরকারি খাচ্ছে। সানোয়ার অবাক হয়ে আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে রইল। এরা কখন এল? তাদের নজর এড়িয়ে কী করে খেতে বসল?

রশিদের চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে। তার মুখভর্তি ভাত, কিন্তু চিবোচ্ছে না। সানোয়ারের দিকে আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। সানোয়ার ভীত গলায় বলল, 'এরা কারা, খালু? কখন আইলো? টেরই পাইলাম না।'

বয় ততক্ষণে মাংসের বাটি নিয়ে ফিরে এসেছে। তাকে দেখে রশিদ কোনো জবাব দিল না। লবণদানি থেকে একরাশ লবণ ছিটিয়ে ভাত মেখে খেতে শুরু করল।

সত্যিই এরা চমৎকার রান্না করে। ঝোলের সঙ্গে মাংসের মিলমিশটা হয়েছে অমৃতসমান। রশিদ ও সানোয়ার দুজনই ক্ষুধার্ত। গোগ্রাসে খেতে গিয়ে ভুলেই গিয়েছিল মাঝরাতের হোটেলের অদ্ভুত খদ্দেরদের কথা। বিরামহীনভাবে দুই থালা ভাত সাঁটিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঢেকুর তুলে রশিদ পানির গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতেই লক্ষ করল ব্যাপারটা, হোটেলটা আবার শূন্য হয়ে গেছে। কোন ফাঁকে যেন খাওয়া শেষ করে প্রত্যেকেই বেরিয়ে গেছে। দিব্যি রাস্তার ধারের হোটেল, কিন্তু কোনো গাড়ির আওয়াজ সে পায়নি। লোকগুলো এল কোত্থেকে আর গেলই-বা কোথায়?

সানোয়ার তখনো মন দিয়ে খাচ্ছে। রশিদ গলা চড়িয়ে ম্যানেজারকে বলল, 'ভাই, আপনের কাস্টমাররা কই গেল?'

ম্যানেজার চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলছিল। সে সোজা হয়ে বসে বলল, 'কোথায় আবার যাবে? যার যার কবরে ফিরে গেছে।'

রশিদ বুঝল, ম্যানেজার তার সঙ্গে মশকরা করছে। সে হাসতে হাসতে বলল, 'তাইলে আমাগো কবরডিও রেডি রাইখেন, ভাই। খাওয়ার পর এট্টু গড়ায়া নিতে পারলে ভালো লাগব।'

ম্যানেজার কিন্তু হাসল না। সে গলা চড়িয়ে বলল, 'বশির, এদের কবর দুইটা রেডি হইছে কি?'

বয় ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মুচকি হেসে বলল, 'কবর খোঁড়ার কাজ চলছে। আরেকটু অপেক্ষা করতে বলেন, আব্বা।'

রশিদ বাপ-ছেলের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। ভাত খেয়ে যতটা খুশি হয়েছিল, দুজনের আলাপ শুনে ততই ক্রুদ্ধ হলো সে। মুখ বিকৃত করে বলল, 'কবর খোঁড়ার কাজ চলতাছে! জিন্দা মানুষরে কবর দেওয়ার আলাপ করেন; এ কেমন মশকরা?'

ম্যানেজার একটা হাই তুলে বলল, 'আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। আপনার সঙ্গে মশকরা করব কেন? জানেন না, এটা মৃতদের হোটেল? মরা মানুষেরাই আমাদের কাস্টমার। রাতের খাবার শেষ হয়েছে। বাইরে গিয়ে দেখে আসুন, সবাই নিজ নিজ কবরে ফিরে গেছে।'

রশিদ বলল, 'যাইতাছি। ফাইজলামি করলে কিন্তু বিল পাইবেন না। মাগনা খাওয়াইতে হইব। আপনের মশকরার দণ্ড।'

সানোয়ারের হাত ধরে রশিদ হন হন করে বাইরে বেরিয়ে এল। আষাঢ় মাসের রাত। আকাশে ঘন হয়ে মেঘ জমেছে। থমথমে অন্ধকারের গুমোট কাটিয়ে বাতাস বইতে শুরু করেছে। পিচগোলা অন্ধকার ভেদ করে দূরে কোথাও ঝিলিক দিয়ে উঠছে নিঃশব্দ বজ্র। সেই অপার্থিব আলোয় হোটেলের উঠানের দিকে তাকিয়ে রশিদ ও সানোয়ারের যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। হোটেলের ধূলিময় উঠানে ফোঁড়ার মতো জেগে উঠেছে নতুন-পুরোনো সারি সারি কবর। সব কটা একেবারে তাজা। কারা যেন কবর ভেদ করে উঠে এসেছিল। এইমাত্র ভেতরে ঢুকে আবারও বুজিয়ে দিয়েছে প্রবেশপথ।

সানোয়ার ততক্ষণে কাঁপতে শুরু করেছে। তার গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছে বীভৎস ভয়। রশিদের ঝুলে থাকা হাতের আঙুল খপ করে ধরে সে কান্নাজড়িত গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি ট্রাক ইস্টার্ট দেন, খালু। আমার খুব ডর করতাছে।'

রশিদ হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। সানোয়ারের হাতের মুঠো শক্ত করে ধরে সে ছুট লাগাল ট্রাকের দিকে। পড়িমরি করে ছুটতে গিয়ে আচমকা হোঁচট খেয়ে পড়ল এক সদ্য খোঁড়া কবরে। টাল খেয়ে ছিটকে পড়ল সানোয়ার। তারও আশ্রয় হলো এক সোঁদাগন্ধি নতুন কবরে।

এক অদ্ভুত আলস্য ভর করেছে তাদের শরীরে। বহুদিনের অপূর্ণ ঘুমে চোখের পাতা যেন জড়িয়ে আসছে। শরীরের সব পেশি শিথিল হয়ে অনন্ত ঘুমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে দেহ। ঘোলা হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি। কানে বাজছে মন্ত্রপাঠের মতো একঘেয়ে মৃদু সুর। শুকিয়ে যাওয়া গলায় যেন নদীর মতো বইছে স্বাদুপানির স্রোত। কবর থেকে উঠে পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারল না রশিদ ও সানোয়ার। যেন এটাই তাদের ঘরবাড়ি। বহুদিন ধরে এমন শান্তির আশাতেই তারা পৃথিবীর জল-মাটি-কাদায় বিচরণ করেছে।

শরীরে কী যেন সরসর করে পেঁচিয়ে ধরছে। সাপ? নাকি আগ্রাসী কোনো লতা? যা-ই হোক, মন্দ লাগছে না। চামড়ার নিচে যেন বেড়ে উঠছে স্বর্ণলতার ডাল। বুকের ভেতর দুই ফুসফুস যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছে। প্রাণভরে শ্বাস নিতে খুব ভালো লাগছে। মিছিমিছি কবরকে এতকাল ভয় পেয়েছে তারা।

চোখ বুজে যাওয়ার আগে তারা দেখল, ম্যানেজার ও বয় মিলে তাদের শরীরে মাটি দিচ্ছে। জমির ভিজে মাটি নয়, তাদের শরীরে যেন ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে। মাতাল করা সুগন্ধ ভাসছে বাতাসে। ম্যানেজার বলল, 'এই প্রথম, এই শেষ। এর পর থেকে নিজে নিজে কবর থেকে উঠতে হবে। খিদে পেলে উঠবেন। খেয়েদেয়ে আবার কবরে শুয়ে পড়বেন।'

মাটির পর মাটি পড়ে ঢেকে যেতে থাকল রশিদ ও সানোয়ারের শরীর। তাদের শ্রবণশক্তি ততক্ষণে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যেও দূরের হাইওয়ে থেকে ভেসে আসা পুলিশের গাড়ির সাইরেন তাদের কানে পড়ল। পথচলতি গাড়ির ড্রাইভাররা ভয়াবহ দুর্ঘটনা দেখে শিউরে উঠল।

হাইওয়ের ধারে খাদের ভেতর উল্টে আছে এক পাথরভর্তি ট্রাক। চালকের আসনসহ সামনের অংশ একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে। ভেতরে চাপা পড়ে মারা গেছে ড্রাইভার ও হেলপার।

অলংকরণ : **তনি সুভংকর**

● আয়োজন



আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের স্বর্ণপদকসহ পাঁচ পদক

চীনের জিনিং কনফুসিয়াস স্কুলে আয়োজিত ১৮তম আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডে (IESO) পাঁচটি পদক অর্জন করেছে বাংলাদেশ দল। দলীয় পর্ব আর্থ সিস্টেম প্রজেক্টে স্বর্ণপদক পেয়েছে মোহাম্মদ তাহমিদ রহমান এবং ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে ফারিস আহমেদ আয়ান। দলীয় পর্ব আন্তর্জাতিক টিম ফিল্ড ইনভেস্টিগেশনেও মোহাম্মদ তাহমিদ রহমান রৌপ্যপদক অর্জন করেছে। একক পরীক্ষায় (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) মোহাম্মদ তাহমিদ রহমান পেয়েছে রৌপ্যপদক এবং শেখ ফাহিম মাহমুদ পেয়েছে ব্রোঞ্জপদক।

আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আন্তর্জাতিক পর্ব আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক ভূবিজ্ঞান শিক্ষা সংস্থা (আইজিইও) কমিটির তত্ত্বাবধানে। চীনের জিনিং কনফুসিয়াস স্কুল ও শানডং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ আয়োজনের যৌথ আয়োজক। অলিম্পিয়াডটি অনুষ্ঠিত হয়েছে আগস্ট মাসের ৭-১৭ তারিখে।

আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আন্তর্জাতিক পর্বে বাংলাদেশ দলের সদস্য হিসেবে অংশ নিয়েছে দিনাজপুর গভর্নমেন্ট কলেজের মোহাম্মদ তাহমিদ রহমান, নটর ডেম কলেজের ওমর বিন আরিফ ও শেখ ফাহিম মাহমুদ এবং সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ফারিস আহমেদ আয়ান। দলের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ইউনুস আহমেদ খান।

আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াড মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ভূবিজ্ঞান ও পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্বব্যাপী একটি বার্ষিক প্রতিযোগিতা। এ বছর বাংলাদেশজুড়ে আয়োজিত একাধিক আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় প্রায় ১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, যার মধ্য থেকে সেরা চারজনকে বাংলাদেশ দলের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়।

বাংলাদেশ ইয়ুথ এনভায়রনমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ (BYEI) ন্যাশনাল আর্থ অলিম্পিয়াড আয়োজন করে। ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর এটি আয়োজিত হয়ে আসছে। এ বছর প্রতিযোগিতার প্রশিক্ষণ সহযোগী প্রাইম ব্যাংক, একাডেমিক সহযোগী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এবং বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক সমিতি। আয়োজনের ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো।

কিআ প্রতিবেদক

গল্প

বারান্দায় সন্ধ্যাতারা

রাফিয়া আলম

ছোট্টবেলা থেকে দেশের বিভিন্ন মফস্‌সল শহরে থেকেছে শেহরিন। বাবার বদলির চাকরি। সেই সুবাদে দেশের বহু জেলায় থাকা হয়েছে শেহরিনের। ওর বয়স এখন তেরো। কদিন আগেই বাবার বদলি হয়েছে ঢাকায়। তাই খুব মন খারাপ শেহরিনের। ঢাকা শহরটাকে ওর মনে হয় ধুলায় ধুলায় ঢাকা। আকাশটা দেখা যায় কি যায় না! এই শহরে আগের শহরগুলোর মতো ফুল নেই, গাছ নেই, সকাল-সন্ধ্যায় কিচিরমিচির করা পাখির দল নেই। নেই ঝিঁঝির ডাক। চারদিকে এত আলো যে অন্ধকারের সৌন্দর্যটা হারিয়ে গেছে জীবন থেকে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো পৌঁছে না উঁচু বাড়ির ছাদটাতেও। পুরোনো দিনের কথা তাই খুব মনে পড়ে ওর আজকাল।

এই বাসাটা একটা খাঁচার মতো। আগের বাসাগুলোর চেয়ে অনেকটাই ছোট। মাঝেমধ্যে দম আটকে আসার মতো অনুভূতি হয় শেহরিনের। উচ্ছলতা হারিয়ে যেতে থাকে ওর জীবন থেকে। বারান্দায় কিছু গাছপালা লাগিয়েছে ওরা। তাতেও অবশ্য প্রকৃতিকে খুব একটা নিজের মতো করে পায় না ও। ফুল আর পাখি যে ওর ভীষণ পছন্দ। কিন্তু বারান্দায় রোদ কম আসে বলে গাছে ফুল ধরে না খুব একটা। কিছু পাখি উড়ে যায় দূরে কোথাও। ঘরের কাছে কোনো পাখির মধুর ডাকে ওর মনটা খুশিতে নেচে ওঠে না।

ওর বাবা খুব ব্যস্ত থাকেন। কাজের চাপেই তাঁর দম ফেলবার সময় নেই। বুঝতেই পারেন না, কী চলছে মেয়ের মনে। কিন্তু ওর মন খারাপের ব্যাপারটা মা ধরে ফেলেন সহজেই। তাঁর নিজেরও যে দম আটকে আসে এই বাড়িটায়। মা অনুভব করেন, শেহরিন তাঁরই মতো প্রকৃতির কাছাকাছি বেড়ে উঠেছে। ইটপাথরের এই যান্ত্রিক শহরে তাই মনে মনে মরে যাচ্ছে মেয়েটা।

মা বুঝতে পারেন, শেহরিনের জীবনে প্রকৃতির আরেকটু ছোঁয়া প্রয়োজন। তাই রোজ ভোরে ওকে নিয়ে রমনা পার্কে হাঁটতে যেতে শুরু করলেন তিনি। প্রকৃতির সান্নিধ্য শেহরিনকে আনন্দ দেয়। এখন রোজ রাতে সে পরের ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করে। ঘুমিয়েও পড়ে জলদি। ভোরে উঠে পার্কে যেতে হবে তো মায়ের সঙ্গে!

দুই

চার দিন ধরে মায়ের শরীরটা একটু খারাপ। হাঁটতে যাওয়া হচ্ছে না আর। পঞ্চম দিন সকাল সকালই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে গেলেন মা। শেহরিনও গেল সঙ্গে। বহির্বিভাগের সামনে পৌঁছাতেই হঠাৎ বকুল ফুলের ঘ্রাণ পেল শেহরিন। তাকিয়ে দেখল, মাটিতে পড়ে আছে অনেকগুলো বকুল ফুল। কোনোটা তরতাজা, কোনোটা আবার মানুষের পায়ের চাপে পিষ্ট। হাসপাতালের সামনের জায়গাটার বাতাসে নানা রকম ঘ্রাণ। এই ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকরও বটে। তবে বকুলের ঘ্রাণে মুগ্ধ হলো শেহরিন।

ডাক্তার দেখানোর পর জানা গেল, বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে মায়ের। বহির্বিভাগ থেকে একটু এগিয়ে গেলে রেডিওলজি বিভাগ। সেখানে টাকা জমা দিয়ে এক্স-রে আর আলট্রাসনোগ্রামের জন্য সিরিয়ালে থাকতে হবে মাকে। রক্ত পরীক্ষার জন্য যেতে হবে এই ভবনের লম্বা, টানা করিডর পেরিয়ে আরেক ভবনে। কফের পরীক্ষার জন্য আবার যেতে হবে অন্য আরেকটি ভবনে। কারণ, হাসপাতাল ভবনে নয়, মেডিকেল কলেজ ভবনের দোতলায় হয় কফ পরীক্ষা।

এই ছোটাছুটিতে মায়ের পাশেই থাকার ইচ্ছা ছিল শেহরিনের। মা বললেন বাবাকে ফোন করে ডেকে নিতে। সেটাই করল শেহরিন। ফোন পেয়ে বাবাও চলে এলেন দ্রুত। আলট্রাসনোগ্রামের জন্য অপেক্ষা করতে করতে নিজেই বেশ অধৈর্য হয়ে উঠলেন। বেলা বাড়ছে। বাড়ছে ভিড়। মানুষ কতটা অসহায়, তা যেন এখানে এসে নতুনভাবে উপলব্ধি করলেন তিনি। অপেক্ষা করার জায়গায় আসনসংখ্যা খুব কম। একজন অসুস্থ মানুষকে নিজের আসনটা ছেড়ে দিল শেহরিন। দাঁড়িয়ে রইল মায়ের পাশে।

বাবা ভাবলেন, এখানে যতটা সময় লাগবে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করতে, ততটা সময় শেহরিনের সত্যিকার অর্থে করার তেমন কিছু নেই। স্ত্রীর পাশে তো তিনি রয়েছেনই। শেহরিনকে বরং আশপাশে কোথাও ঘুরে আসতে বলা যায়। ওর তো আজ ক্লাস নেই। এই ভেবে তিনি ফোন করলেন ভাতিজি পুনমকে। শেহরিনের পুনম আপু। পুনম আপু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী। সবটা শুনে পুনম আপু জানাল, সে এসে শেহরিনকে নিয়ে যাচ্ছে এক্ষুনি।

মিনিট কুড়ি পর পুনম আপু হাজির। হাসিখুশি মানুষ পুনম আপু। শেহরিন ঢাকায় আসার পর অবশ্য তার সঙ্গে মাত্র একবারই দেখা হয়েছে। আর দেখা হলো আজ। আপু সঙ্গে করে নিজের ক্যাম্পাসে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। ওর ক্যাম্পাসটা নাকি খুব সুন্দর।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই মুগ্ধ হয়ে গেল শেহরিন। ক্যাম্পাসটা সত্যিই অন্য রকম। একটু এগোতেই চোখে পড়ল কাঠগোলাপগাছ। গাছের নিচে পড়ে আছে কিছু ফুল। আরে! একটা কাঠবিড়ালি! দৌড়ে গেল ওপাশটায় চোখের নিমেষে। পাখিও আছে আশপাশে। খুশি হয়ে উঠল শেহরিন।

আপু বলল, 'কী রে, কেমন লাগছে?'

'দারুণ!' বলল শেহরিন। 'থ্যাঙ্ক ইউ, পুনম আপু!'

ভেতরটাও ঘুরে দেখল ওরা। কী চমৎকার পরিবেশ। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ ক্লাসরুমের বাইরে বসে ছবি আঁকছে। দৃশ্যটা অসাধারণ মনে হলো ওর কাছে। ও ফিরে এল কাঠগোলাপগাছটার কাছে। কিছু ফুল কুড়িয়ে নিল। এই ক্যাম্পাসেও আছে বকুলগাছ। নিচের বাঁধানো জায়গাটাতে ও বসে থাকল অনেকক্ষণ।

তিন

কদিন পর মা সুস্থ হলেন। স্কুলের পড়ালেখার চাপও বাড়ছিল শেহরিনের। আগের মতো রোজ আর রমনা পার্কে যাওয়া হয়ে ওঠে না। মা তো বোঝেন, শেহরিনের মন কাঁদে। এর মধ্যেই মা একদিন শেহরিনের ঘরের বারান্দায় পাখিদের জন্য একটা পানির পাত্র রাখলেন। আরেকটা পাত্রে ছড়িয়ে দিলেন কিছু দানা। মনে আশা, যদি দু-একটা পাখি আসে। পাখি কিন্তু সত্যিই এল। কিচিরমিচির করে খাবার খেল। পানির পাত্র থেকে শুধু পানিই খেল না, তাতে গা ভিজিয়ে আনন্দও করল কিছুক্ষণ। আর তাতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেল শেহরিন।

পাখির জন্য নিয়ম করে পানি আর খাবার রাখা এবং পাত্রগুলো পরিষ্কার করার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিল সে। রোজ সকালের এই কাজটা একটা রুটিন হয়ে দাঁড়াল ওর জন্য। সারা দিনে কয়েকবার ওর বারান্দায়

আসতে শুরু করে কয়েকটা চড়ুই, এক জোড়া বুলবুলি আর এক জোড়া মৌটুসি পাখি। পড়ার ফাঁকে ওরাই এখন ওর প্রশান্তি। এক জোড়া চড়ুই পাখি বাসাও গড়ে নিল বারান্দার ওপরের দিকটায়।

হঠাৎ এক সকালে শেহরিন দেখল, বারান্দার টবে অন্য গাছের পাশ দিয়ে একটা নতুন চারা গজিয়ে উঠছে। আরে! দেখে তো সন্ধ্যাতারার চারা মনে হচ্ছে। এই ফুলটার আরেকটা নাম আছে—সন্ধ্যামালতী।

মাকে ডেকে দেখানোর পর মা বললেন, 'হ্যাঁ। সন্ধ্যাতারার চারাই তো রে। নিশ্চয়ই তোর পাখিরা বয়ে এনেছে এই সন্ধ্যাতারার বীজ।'

সন্ধ্যাতারার চারা বেড়ে উঠতে থাকল শেহরিনের অন্য গাছেদের সঙ্গে। শেহরিন অবশ্য ফুলের ব্যাপারে সন্দিহান। আদৌ এই গাছে ফুল ফুটবে তো! খুব একটা রোদ না পাওয়ায় অন্য গাছগুলোতে তো তেমন ফুল হয় না। কেবল পাতাই হয়। মা অবশ্য বেশ আশাবাদী এই গাছটার ব্যাপারে।

চার

শেহরিন আজ অনেক খুশি। সন্ধ্যাতারা গাছে ফুল ফুটেছে। গাঢ় ম্যাজেন্টা রঙের ফুল। শেষ বিকেলের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে ফুলটা। বারান্দার চেহারাটাই যেন বদলে গেছে এই একটা ফুলের উজ্জ্বলতায়। গাছে কলি আছে আরও বেশ কয়েকটা। মনে হচ্ছে, ফুলে ফুলে ভরে উঠবে গাছটা আর কদিন পরেই। আরও একটা চমৎকার কারণ আছে শেহরিনের খুশির পেছনে। সকালেই সে আবিষ্কার করেছে চড়ুই পাখির বাসায় ডিম ফুটে এক জোড়া ছানা বেরিয়েছে। একখণ্ড প্রকৃতি এখন সত্যিই তার বারান্দায় হাজির হয়েছে। পাখিরা ওর কাছে পেয়েছে এক নিরাপদ আশ্রয়। আর ওদের আনা বীজ থেকে যে গাছটা হয়েছে, সেই গাছটার ফুলেই তো ওর বারান্দা আলো করে ফুটেছে অদ্ভুত মায়াময় এক সন্ধ্যাতারা। সন্ধ্যাতারার বাকি কলিগুলোও নিশ্চয়ই ফুল হয়ে ফুটবে। শেহরিন সেই সন্ধ্যার অপেক্ষায় আছে।

অলংকরণ : **এস এম রাকিব**

● শব্দের খেলা

শব্দভেদ

শব্দভেদ মেলানোর নিয়ম সহজ। বাঁ থেকে ডানে এবং ওপর থেকে নিচে দেওয়া থাকে সংখ্যা। সংখ্যা অনুযায়ী দেওয়া থাকে সংকেত। সে অনুযায়ী শব্দ খুঁজে ফাঁকা ঘরে বসালেই শব্দভেদ। তোমাদের জন্য শব্দভেদ বানিয়েছেন **সুমন মাহমুদ**

১	২		■	৩		■	৪
■		■	৫		■	৬	
৭		৮		■	৯		■
	■		■	১০		■	১১
১২	১৩		১৪		■	১৫	
■		■		■	১৬		■
১৭	■	১৮		১৯	■	২০	
২১			■	২২			■

বাঁ থেকে ডানে

১. পর্বত। ৩. শক্তি, সামর্থ্য। ৫. গভীর, গাঢ়। ৬. অংশ, বিভাজন। ৭. প্রয়োজন, আবশ্যকতা। ৯. শিষ্টাচারপূর্ণ, মার্জিত। ১০. হ্রাস, বিনাশ। ১২. মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবে, এমন প্রতিজ্ঞাযুক্ত। ১৫. বন্ধু, মিত্র। ১৬. বর্ণ, রঞ্জনদ্রব্য। ১৮. আগুন, অগ্নি। ২০. পিতা, জনক। ২১. বিপরীত কল্পনা, পরিবর্তে কল্পনা। ২২. বারবার অনুরোধ বা দাবি, তাগাদা।

ওপর থেকে নিচে

২. উপস্থিত, আগত। ৩. অরণ্য, কানন। ৪. সংকলন, সমষ্টি। ৫. গৃহ, আলয়। ৬. বাংলা সনের পঞ্চম মাস। ৭. দশের পূরক। ৮. হেতু, নিমিত্ত। ৯. ডর, গ্রাস। ১০. সময়, মুহূর্ত। ১১. শিক্ষা বা জ্ঞান লাভ করা। ১৩. রুধির, শোণিত। ১৪. বাতাস, বায়ু। ১৫. খবর, বার্তা। ১৭. চিত্র, প্রতিকৃতি। ১৮. সামান্য, কম। ১৯. বল্লরি, ব্রততী।

গত সংখ্যার সমাধান

ভ	য়	■	খা	ম	■	পা	কা
র	■	ভো	লা	■	প	থ	■
সা	গ	র	■	মে	■	র	স
■	জা	■	দো	য়ে	ল	■	ঞ্চা
কা	রি	গ	র	■	লা	ঙ	ল
গ	■	ম	■	পা	ট	■	ন
জ	ল	■	কা	চ	■	ঘ	■
■	ক্ষ	মা	■	ক	ল	র	ব

আগস্ট মাসের শব্দভেদ বিজয়ী

ইয়াশনা বিনতে আজিজ

৮ম শ্রেণি, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা

'শব্দভেদ'-এর উত্তর মিলিয়ে পাঠাও

editor@kishoralo.com—এই ঠিকানায়। বিজয়ীদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে একজন পাবে প্যাভিলিয়নের পক্ষ থেকে 'শব্দজব্দ' বোর্ডগেম।

উত্তর পাঠানোর শেষ সময় ২০ সেপ্টেম্বর।

শব্দজব্দ

অর্ডার করতে ভিজিট করো—www.shobdojobdo.com

কিশোর আলোর গ্রাহকেরা শব্দজব্দ অর্ডার করলেই পাবে

বিশেষ ডিসকাউন্ট

৬ মাসের গ্রাহকদের জন্য প্রোমো কোড : KIA10

১২ মাসের গ্রাহকদের জন্য প্রোমো কোড : KIA15

বিজ্ঞানের Big Fun With রাতুল ভাইয়া



তুমি কি বিজ্ঞানবাক্স ব্যবহার করো? বিজ্ঞানবাক্স কিনতে গিয়ে, এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে কি এমন কোনো মজার ঘটনা ঘটেছে যেটা তুমি বলতে চাও? অথবা তোমার মাথায় কি এমন কোনো আইডিয়া এসেছে যা সবাই জানলে চমকে যাবে?

তাহলে সময় এখন তোমারই! এখন তুমি রাতুল ভাইয়ার সাথে অনলাইনে আড্ডা দিতে পারবে বিজ্ঞানবাক্স নিয়ে। তোমার গল্পটা শুনবে সারা বাংলাদেশ!

এখন থেকে প্রতি মাসে আমরা এমন অন্তত দুটি সেশন করতে চাইছি।
“বিজ্ঞানের Big Fun With রাতুল ভাইয়া”
লাইভ হবে গুগল মিট বা জুমে ।

৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী যে কেউ অংশ নিতে পারবে এখানে।

অংশ নিতে হলে
কিউআর কোড স্ক্যান করে
ফর্মটি পূরণ করো।

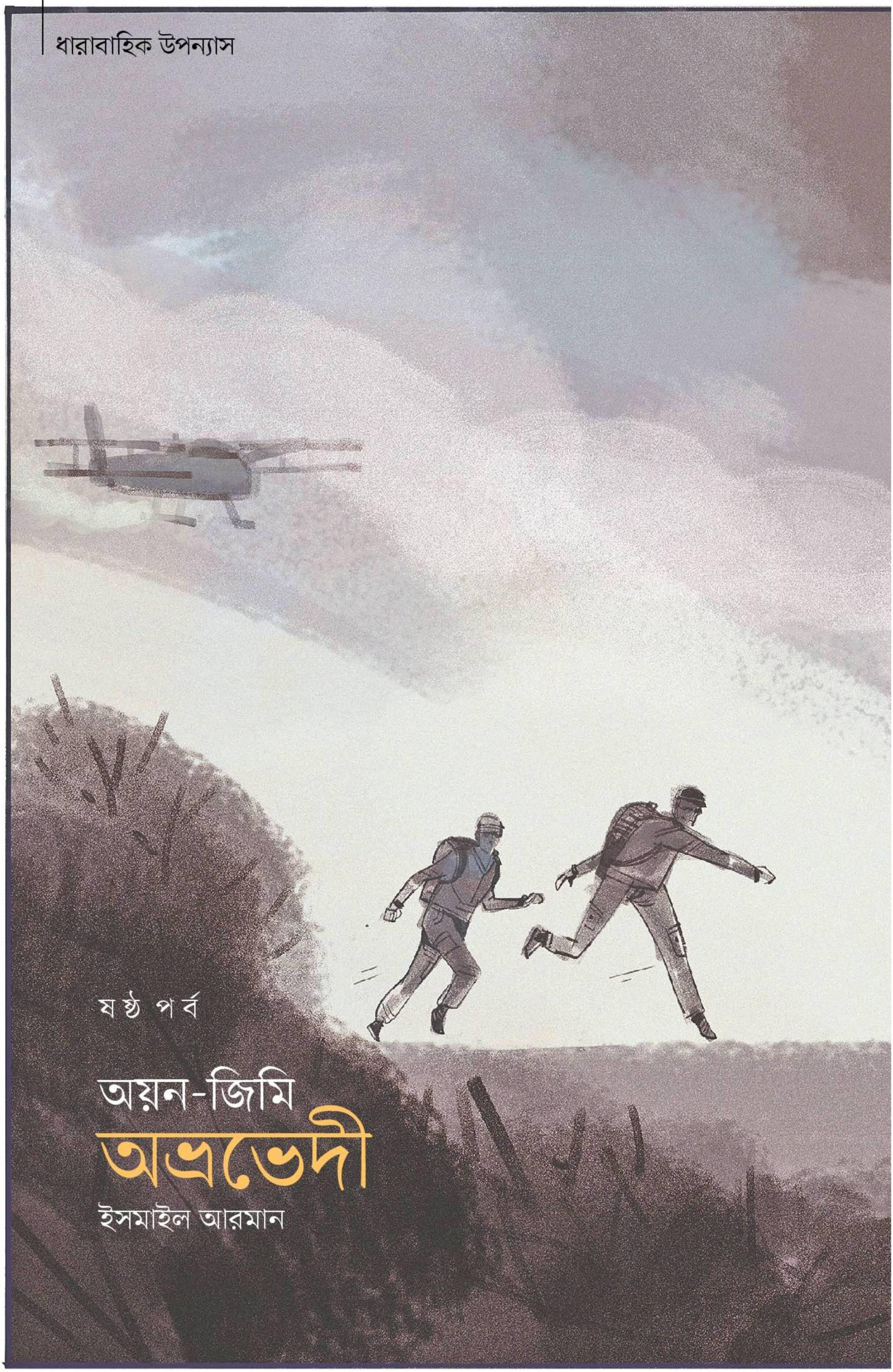
বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে

এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং

bigganbaksho.com

অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স

ধারাবাহিক উপন্যাস



ষষ্ঠ পর্ব

অয়ন-জিমি অভ্রভেদী

ইসমাইল আরমান

গত সংখ্যার পর...

বারো

'আপনারা বলতে চাইছেন, একটা ফাইটার এসে এই কাণ্ড করেছে?' গম্ভীর গলায় বললেন শেরিফ ডুহান। 'ভুতুড়ে ফাইটার?'

'ফাইটার বলেছি,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করল ক্রিস্টিন। 'ভুতুড়ে বলিনি!'

'ওই একই কথা,' বললেন শেরিফ। 'কদিন আগেও তো রিপোর্ট লিখিয়েছেন আপনারা; একটা ফাইটার আপনাদের ফ্লাইংয়ে বাধা দিচ্ছে। ক্লাউড পিয়ার্সার...তা-ই না?'

'সেবারও কিন্তু ভূতের কথা বলিনি।'

'আচ্ছা, ভূতের প্রসঙ্গটা বাদই দিলাম,' মাথা নাড়লেন শেরিফ। 'কিন্তু একটা ফাইটার এসে আপনাদের হ্যাঙ্গারে বম্বিং করে গেছে, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?'

'আমরা সবাই দেখেছি, কেন বিশ্বাস করছেন না? ওটা একটা পি-ফিফটি ওয়ান মাসট্যাং ছিল।'

'ইয়াং লেডি,' থমথম করছে শেরিফের চেহারা, 'পুরোনো বিমান সম্পর্কে কমবেশি আমিও জানি। পি-ফিফটি ওয়ান বোমা বহন করতে পারে না। ওটার একমাত্র অস্ত্র হলো হেভি মেশিনগান।'

সকালবেলার ঘটনা। বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ক্লাব হাউসে বসে আছে সবাই। রাতে আগুন লাগার কিছুক্ষণ পরই স্থানীয় পুলিশ আর ফায়ার সার্ভিস হাজির হয়ে গিয়েছিল। সবার সম্মিলিত চেষ্টায় আগুনটা ভালোমতো ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা গেছে। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার, তা হয়ে গেছে আগেই। ক্রিস্টিনদের একটা বিমানও



পুরোপুরি অক্ষত নেই। বিশেষ করে দুটো পিটস স্পেশাল আর তিনটে অ্যারোব্যাট বিমান একদম পুড়ে গেছে। রায়ানের সেসনার অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। মেরামত করতে অনেক সময় লাগবে।

ক্রিস্টিন রীতিমতো ভেঙে পড়েছে দুর্ঘটনাটা দেখে, তার ওপর সকাল হতে না হতেই শেরিফ এসে উল্টোপাল্টা জেরা শুরু করেছেন।

গ্রেগ ডুহান বিশ বছর ধরে অ্যাভালন আইল্যান্ডে আছেন। দ্বীপের একমাত্র ছোট্ট পুলিশ ফাঁড়িটার দায়িত্ব পেয়েছেন, তা-ও দশ বছরের মতো হয়ে গেল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কেস পাননি। অ্যাভালন আইল্যান্ড ছোট্ট জায়গা, জনসংখ্যা অল্প, তাই অপরাধের মাত্রাও কম। চুরিচামারি যা হয়, তা সামাল দিতে তিনি আর তাঁর দুই ডেপুটিই যথেষ্ট। পুলিশের চাকরি করেও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু এমন সময় বোমাবাজির ঘটনা তাঁর শান্তি কেড়ে নিয়েছে। বুঝতে পারছেন, এ নিয়ে ভোগান্তি যাবে। মেজাজ খিঁচড়ে আছে, সবাইকে উল্টাসিধা প্রশ্ন করে রাগটা কমানোর চেষ্টা করছেন। যদিও তাতে বিশেষ লাভ হচ্ছে না।

সবার দিকে কড়া চোখে আরেকবার তাকালেন তিনি। বললেন, 'কাজেই আবার বলছি, আমাকে আষাঢ়ে গল্প শোনাতে যাবেন না। পি-ফিফটি ওয়ান বোমা মারতে পারে না।'

'কী পারে বা কী পারে না, জানি না,' বলল মেরি। 'তবে ওটাই দায়ী। আমরা নিজ চোখে দেখেছি।'

'বোমাটা আকাশ থেকে পড়তে দেখেছেন?'

পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সবাই। তারপর মাথা নাড়ল। বার্নি বলল, 'তখন অন্ধকার ছিল। আপনি অযথা আমাদের হয়রানি করছেন।'

'এক মিনিট,' হঠাৎ বলে উঠল অয়ন। 'শেরিফের কথায় যুক্তি আছে।' তারপর ডুহানের দিকে ফিরল। 'হ্যাঙ্গারের গায়ে কি কোনো ফুটো পাওয়া গেছে?'

'না,' শেরিফ মাথা নাড়লেন। 'আগুন নেভার পর আমি নিজে গিয়ে ওখানটা দেখে এসেছি।'

'বোমাটা আকাশ থেকে ফেললে তো হ্যাঙ্গার ফুটো করেই ভেতরে ঢুকবে, তাই না? আমরা হ্যাঙ্গারের টিন ভাঙারও কোনো শব্দ পাইনি। যত দূর মনে পড়ছে, আগুনটা হ্যাঙ্গারের ভেতর থেকেই আচমকা লাফিয়ে উঠল।'

'তার মানে?' বার্নি ভুরু কোঁচকাল।

'বোমাটা হয়তো আগে থেকেই ভেতরে পেতে রাখা হয়েছিল,' বলল অয়ন। 'পরে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

ওর দিকে অপলক খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শেরিফ, তাঁর চোখেমুখে প্রশংসার আভাস ফুটল। খুশি খুশি গলায় বললেন, 'এই ছেলের মাথায় বুদ্ধি আছে।' তারপর অন্যদের দিকে ফিরলেন। 'অতএব বুঝতেই পারছেন, ফাইটারটা স্রেফ একটা কাকতালীয় ব্যাপার। বোমার জন্য অন্য কেউ দায়ী। ওটাকে খুব বেশি হলে আপনাদের ঘুম ভাঙানোর দায়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন তিনি।

'ভুল বললেন, শেরিফ,' বলল রিয়া। 'ওটার অবশ্যই হাত আছে। ইচ্ছা করেই আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছে ফাইটারটা, উঠানে নিয়ে গেছে...যাতে বিস্ফোরণটা আমাদের চোখের সামনে ঘটে।'

'শুধুই থিওরি,' শেরিফ বললেন। 'প্রমাণ করতে পারবে?'

মুখ কালো হয়ে গেল রিয়ার।

'কাজেই ও কথা বলে লাভ নেই,' ডুহান তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। 'আমার কাজ ফ্যাক্টস নিয়ে, থিওরি নয়।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'আমি আসি।'

'আপনার তদন্ত কোন পথে এগোবে, জানতে পারি?' জিজ্ঞাসা করল ডবকিন।

'এ ধরনের অপরাধ তদন্ত করার মতো রিসোর্স নেই আমার কাছে,' বললেন শেরিফ। 'মেইনল্যান্ডে খবর পাঠাচ্ছি। বম্ব স্কোয়াড আসুক, যা করার ওরাই করবে। এয়ারফোর্সকেও জানাতে হতে পারে...ফাইটারের বিষয় যখন। বাই দ্য ওয়ে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা কেউ দ্বীপের বাইরে যাবেন না।'

'আমরা এখানকার কেউ নই,' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল রায়ান।

'সবার জন্য এক নিয়ম,' কড়া গলায় বললেন শেরিফ। 'অপরাধী যে অ্যাভালন আইল্যান্ডেরই লোক হবে, এমন কোনো কথা আছে?'

শুনে চুপসে গেল রায়ান।

মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল ক্রিস্টিন।

'শান্ত হও,' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল রায়ান। 'কেঁদে লাভ কী? শক্ত হতে হবে তোমাকে।'

'সব শেষ হয়ে গেছে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ক্রিস্টিন। 'বাবার সারা জীবনের সাধনা...চোখের পলকে সব ধ্বংস হয়ে গেল...'

'প্লেনগুলো বিমা করানো ছিল না?' জিজ্ঞাসা করল অয়ন।

'তা ছিল,' ডবকিন জানাল। 'কিন্তু বিমার টাকা পেতে অনেক প্রক্রিয়া আছে। অন্তত পুলিশের তদন্ত শেষ না হলে কিছুই পাওয়া যাবে না। টাকা পেলেও-বা কী? এসব বিমান টাকা দিয়ে পাওয়া যায় না। এত পুরোনো বিমান... আমাদের নিজস্ব চাহিদা অনুসারে কাস্টমাইজ করা... বদলে ফেলা সহজ কাজ নয়। তা ছাড়া ওগুলোর ওপর মায়াও পড়ে গিয়েছিল আমাদের। আবেগ তো আর বদল করা যায় না।'

বিষাদে ছেয়ে গেছে তিন বন্ধুর মন। তদন্ত করে লাভ হলো না। শয়তান লোকটা হারিয়ে দিয়েছে ওদের। হোয়াইট ফ্যালকন দলটা বরবাদ হয়ে গেছে, দ্বীপ ছেড়ে এবার ওদের চলে যেতেই হবে।

কিন্তু না, এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয় অয়ন। বদমাশটাকে ঠেকাতে না পারুক, অন্তত শাস্তি তো দিতে পারবে। লোকটাকে খুঁজে বের করবে ওরা, তার মোটিভটা জানবে; তারপর তাকে তুলে দেবে আইনের হাতে। হ্যাঁ, এভাবেই প্রতিশোধ নেবে ওরা।

দুই বন্ধুকে নিয়ে ক্লাব হাউস থেকে বেরিয়ে এল ও। নিজের সিদ্ধান্তটা জানাল ওদের।

'ঠিক বলেছিস,' একমত হলো জিমি। 'এত সহজে ব্যাটাকে পার পেতে দেওয়া যায় না।'

'কার সঙ্গে লাগতে গেছে টের পায়নি তো,' রিয়াও উৎসাহ দেখাল। 'ওর চেয়ে ভয়ংকর অপরাধীদেরও অতীতে শায়েস্তা করেছি আমরা।'

'গুড,' বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া দেখে খুশি হলো অয়ন। 'তবে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। লোকটা সাংঘাতিক, বোমা ব্যবহারে পিছপা হয়নি।'

'সাহস থাকলে আসুক আরেকবার বোমা নিয়ে,' জামার আস্তিন গোটাতে লাগল জিমি। 'ওই বোমা ওর পশ্চাদ্দেশে ফাটাব।'

'হয়েছে, আর বড়াই করতে হবে না।' হাত তুলে ওকে থামাল রিয়া, হাসছে। 'আগে লোকটাকে খুঁজে তো বের করি।'

‘ভালো কথা বলেছ,’ আস্ফালন থামাল জিমি। তাকাল অয়নের দিকে। ‘কাকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি আমরা? ব্রিক প্যাটারসনকে?’

‘অবশ্যই,’ বলল অয়ন। ‘সে-ই প্রথম সাসপেক্ট।’

‘কিন্তু তার সম্পর্কে তো কিছুই জানি না আমরা,’ হতাশ গলায় বলল জিমি। ‘খুঁজে পাবি কী করে? এমনকি হ্যাগার্টিও কিছু বলতে পারল না।’

‘কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানে,’ অয়ন বলল। ‘চল, ক্রিস্টিনদের জিজ্ঞাসা করে দেখি।’

ক্লাব হাউসে ফিরে ওরা দেখল, সাংবাদিক ওয়েবার এসেছে। মেরির মুখে রাতের ঘটনাটা শুনে তার নোট নিচ্ছে।

ক্রিস্টিনের কাছে গিয়ে অয়ন বলল, ‘এক্সকিউজ মি, ক্রিস্টিন। একটা প্রশ্ন করব?’

চোখের পানি মুছল ক্রিস্টিন, তারপর বলল, ‘করো।’

‘ব্রিক প্যাটারসন নামে কাউকে চেনেন আপনি?’

ঝট করে ঘরের সব কটা চোখ ওর দিকে ঘুরে গেল। ডবকিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ‘তার কথা তুমি জানলে কেমন করে?’

‘যেভাবেই হোক, জেনেছি।’ ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না অয়ন। ‘দেখা যাচ্ছে লোকটাকে আপনারা চেনেন।’

‘ঠিক চিনি বলা যাবে না,’ ক্রিস্টিন বলল। ‘সান ফ্রান্সিসকোয় অল্প সময়ের জন্য একবার দেখা হয়েছে... মানে সে-ই এসেছিল আমাদের কাছে। এখানে আসার অল্প কিছুদিন আগে।’

‘ল্যান্ড অফিস?’ কথাটা জিমি বুঝতে পারেনি।

‘ভূসম্পত্তি বিভাগের সরকারি অফিস,’ বুঝিয়ে দিল বেন।

‘আছে নাকি এখানে?’ জিজ্ঞাসা করল অয়ন।

‘গাঁয়ের ভেতরে,’ জানাল ক্রিস্টিন।

‘তাহলে তো এক্ষুনি যাওয়া দরকার,’ অয়নের কণ্ঠে তাড়া। ‘পাবলো, নিয়ে যাবেন আমাদের?’

‘এদিকে অনেক ঝামেলা,’ পাবলোর কণ্ঠে দ্বিধা।

‘আমি একটা লিফট দিতে পারি,’ বলল ওয়েবার। ‘ওদিকেই যাব কিনা। তবে তোমাদের একা ফিরতে হবে। আমার অন্য কাজ আছে।’

‘চলবে,’ বলল অয়ন।

‘এসো তাহলে।’

সাংবাদিকের পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল তিন বন্ধু।

তেরো

গ্রামের এক প্রান্তে ভূসম্পত্তি বিভাগের অফিস। বাইরে একটা ময়লা সাইনবোর্ড ঝুলছে :

ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট
ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড প্রপার্টিজ
অ্যাভালন আইল্যান্ড।

ভবনটা একতলা, ছোট। চারপাশটা ভীষণ নোংরা। ওটার সামনে এসে থামল ওয়েবারের ভাড়া করা গাড়িটা। নেমে পড়ল তিন বন্ধু।

‘আমি তাহলে যাই,’ বলল সাংবাদিক। ‘তোমরা একা ফিরতে পারবে তো?’

‘পারব,’ বলল অয়ন। ‘আপনি যান।’

‘ঠিক আছে,’ বলল ওয়েবার। ‘আমার কাজ শেষ হলে আবারার পথে একটা চক্কর দিয়ে যাব নাহয়।’

‘আপনি যা ভালো মনে করেন।’

গাড়ি চালিয়ে চলে গেল সাংবাদিক। অফিসে ঢুকল তিন বন্ধু। ভেতরে ঢুকতেই বড় একটা কামরা পড়ল। তিন দিকের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে অনেকগুলো বড় আলমারি। শেষ মাথায় একটা গরাদ দেওয়া জানালার সামনে রয়েছে পুরোনো একটা ডেস্ক টেবিল, তার পেছনে বয়স্ক এক লোক বসা। টেবিলে ঝুঁকে কাজ করছিল সে, ওদের ঢোকার শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকাল।

‘গুড মর্নিং,’ কাছাকাছি পৌঁছে অভিবাদন জানাল অয়ন।

‘গুড মর্নিং,’ প্রত্যুত্তর দিল লোকটা। তারপর চেয়ার দেখাল, ‘বসো।’

তিনটা চেয়ার টেনে বসল গোয়েন্দারা। হাতের কাজ শেষ করে ফাইল বন্ধ করল লোকটা, উঠে গিয়ে একটা আলমারিতে রাখল, তারপর ফিরে এল নিজের চেয়ারে। আগ্রহী চোখে তাকাল ওদের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, ‘কিছু করতে পারি তোমাদের জন্য?’

‘অ্যাভালন আইল্যান্ডের লিজটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। নাছোড়বান্দা লোক, আস্ত অভদ্র। প্রথমে ভালোভাবে মানা করলাম। শোনে না। শেষে দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি।’

‘কেন দেখা করেছিল?’

‘অ্যাভালন আইল্যান্ডের লিজটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। নাছোড়বান্দা লোক, আস্ত অভদ্র। প্রথমে ভালোভাবে মানা করলাম। শোনে না। শেষে দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি।’

‘বটে!’

‘হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন?’ ক্রিস্টিন বিস্মিত। ‘তোমরা কি তাকে এসবের জন্য সন্দেহ করছ?’

‘দারুণ ব্যাপার তো!’ বলে উঠল ওয়েবার। ‘খুদে গোয়েন্দারা দেখছি শুধু কথায় নয়, কাজেও খাঁটি গোয়েন্দা।’

‘গোয়েন্দাগিরির কথা কে বলল আপনাকে?’ ভুরু কোঁচকাল রিয়া।

‘আমি,’ লজ্জিত গলায় বলল বার্নি। ‘কাল রাতে কথায়-কথায় মুখ ফসকে বলে ফেলেছি। সরি, আসলে তোমাদের তেমন গুরুত্ব দিইনি।’

‘বুঝেছি,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল অয়ন। ‘যাকগে, ব্রিক প্যাটারসন সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারেন আমাদের?’

সবাই মাথা নাড়ল।

ক্রিস্টিন বলল, ‘একটা কাজ করতে পারো। ল্যান্ড অফিসে খোঁজ নাও। জমিজমার ব্যাপার তো, লিজের জন্য কোনো আবেদন করে থাকলে তার সঙ্গে নিজের তথ্যগুলোও দিতে হয়েছে নিশ্চয়ই।’

‘আমার নাম অয়ন,’ নিজের পরিচয় দিল অয়ন। ‘আর এরা হলো আমার বন্ধু জিমি আর রিয়া। বেড়াতে এসেছি অ্যাভালন আইল্যান্ডে।’

‘পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,’ বলল লোকটা। ‘আমি ফ্রেড মরটন। এই অফিসের কেরানি থেকে শুরু করে বস...যা খুশি বলতে পারো আমাকে।’ নিঃশব্দে হাসল সে।

‘এই অফিস আপনি একা চালান?’ রিয়া অবাক হয়েছে। ‘কষ্ট হয় না?’

‘কাজের চাপ নেই, তাই কষ্টও হয় না,’ বলল মরটন। ‘এ রকম ছোট্ট দ্বীপে জমিজমার কেনাবেচা হয় না খুব বেশি। আমার মূল কাজ ট্যাক্স কালেকশন আর ল্যান্ড সার্ভে। বিশ বছর ধরে করছি এসব।’

‘মাই গড!’ চোখ কপালে তুলল জিমি। ‘বি-ই-শ বছর ধরে আছেন এখানে?’

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল মরটন। ‘আমি এই দ্বীপেরই মানুষ, তাই অন্য কোথাও পোস্টিং নেওয়ার চেষ্টা করিনি। ভালোই আছি এখানে।’

‘এত লম্বা সময় ধরে যখন আছেন, তাহলে তো এখানকার সবকিছুই আপনার জানা।’

‘তা তো জানিই,’ বলল মরটন। ‘তোমরা কি কোনো কাজে এসেছ এখানে?’

‘হ্যাঁ,’ অয়ন বলল। ‘একটা লিজের ব্যাপারে জানতে চাই।’

ভ্রুকুটি করল মরটন। ‘জমিজমার খোঁজ নেওয়ার জন্য বয়সটা একটু কম হয়ে গেল না?’

‘না, না,’ তাড়াতাড়ি বলল অয়ন, ‘আমরা লিজ নেব না। এক ভদ্রলোককে খুঁজছি। ভাবলাম, এখানে হয়তো পাওয়া যাবে।’

‘মানুষের খোঁজ তো শেরিফ দেবে। আমার কারবার জমি নিয়ে।’

‘শুনেছি, ভদ্রলোক এখানে জমি নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আবেদন করেছেন নিশ্চয়ই...’

‘কার কথা বলছ?’

‘ওনার নাম ব্রিক প্যাটারসন।’

‘হা ঈশ্বর! পাগল...ওই ব্যাটা পাগল একটা।’

‘চেনেন লোকটাকে?’ জিজ্ঞাসা করল জিমি।

‘চিনব না মানে!’ বলল মরটন। ‘আমার রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল। এয়ারফোর্সের এলাকাটা লিজ নেওয়ার জন্য সে কী জোরজবরদস্তি! আমি যতই বলি, আমার কিছু করার নেই, সে মানতেই চায় না। জোঁকের মতো লেগে গিয়েছিল পেছনে।’

‘আপনার কিছু করার ছিল না কেন?’ জিজ্ঞাসা করল অয়ন।

‘থাকবে কেমন করে? ওর কমপক্ষে এক মাস আগে ক্লেইম করে গেছে মিস ক্রিস্টিন অ্যাডামস, ফর্মালিটিজ প্রায় শেষ, যেকোনো মুহূর্তে দলিল হয়ে যাবে...এ অবস্থায় আমার কিছু করার থাকে?’

‘আর মিস অ্যাডামস যদি লিজ ছেড়ে দেয়?’ অয়ন প্রশ্ন ছুড়ল।

‘যে কেউ নিতে পারে,’ মরটন বলল। ‘সে কথা বলেছিলামও তাকে।’

‘তারপরই শান্ত হলো সে, ঠিক না?’ অয়ন একটা উপসংহারে পৌঁছাতে চেষ্টা করছে।

‘দুটো পরামর্শ দিয়েছিলাম,’ কাঁধ ঝাঁকাল মরটন। ‘কোনটা শুনে শান্ত হয়েছে, কী করে বলি?’

‘বুঝেছি,’ বলল অয়ন। ‘ভদ্রলোকের ঠিকানাটা পেতে পারি? ওনাকে আমাদের ভীষণ প্রয়োজন।’

‘দিচ্ছি,’ বলে আলমারি থেকে একটা ফাইল আনল মরটন। ব্রিক প্যাটারসনের আবেদনপত্রটা বের করে ঠেলে দিল অয়নের দিকে, ওটার নিচে আবেদনকারীর ঠিকানা আছে। একটুকরো কাগজ নিয়ে ঠিকানাটা টুকতে লাগল অয়ন।

‘আপনার দ্বিতীয় পরামর্শটা কী ছিল?’ আনমনে প্রশ্ন করল রিয়া।

‘প্যাটারসনকে বললাম, যদি এয়ারস্ট্রিপই দরকার হয়, তো এম্পটি আইল্যান্ডে যাচ্ছেন না কেন?’ বলল মরটন।

লিখতে লিখতে হঠাৎ থেমে গেল অয়ন। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল মরটনের দিকে।

‘ক্...কী বললেন?’

‘কখন?’

‘এই তো, এখন! এম্পটি আইল্যান্ডে এয়ারস্ট্রিপ আছে?’

‘হ্যাঁ, আছে তো। এয়ারফোর্সই তৈরি করেছিল, ইমার্জেন্সির জন্য। অবশ্য খুব বেশি লোকে জানে না ওটার কথা। কখনো ব্যবহার করা হয় না তো, ভুলেই গেছে।’

খসখস করে ঠিকানার বাকি অংশটা লিখে কাগজটা পকেটে পুরল অয়ন। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমরা তাহলে আসি। অনেক উপকার করলেন, ধন্যবাদ।’

‘ইউ আর ওয়েলকাম,’ হাসল মরটন।

বন্ধুদের নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল অয়ন। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে। টান দিয়ে ওকে থামাল রিয়া। প্রশ্ন করল, ‘কী ব্যাপার, তুমি এত উত্তেজিত কেন?’

‘চিন্তা করে দেখো,’ অয়ন বলতে গেলে একরকম হাঁপাচ্ছে, ‘ডোনোভান এস্টেটে ক্লাউড পিয়ার্সারের থাকার সম্ভাবনা কতটুকু?’

‘মানে?’

‘কোনো বুদ্ধিমান লোক কি ওখানে বিমানটা রাখবে? খোঁজ পড়লে তো সবার আগে ওখানেই ক্লাউড পিয়ার্সারকে খোঁজা হবে।’

‘লুকিয়ে রেখেছে হয়তো।’

‘একটা বিমান লুকানো যা-তা কথা নয়। বিশেষ করে ওটাকে যখন প্রায়ই ওড়াতে হয়।’

‘তাহলে গতকাল যে বলছিলে!’

‘তখন তো জানতাম, এয়ারফোর্সেরটা ছাড়া ওটাই এই এলাকার একমাত্র এয়ারস্ট্রিপ।’

‘তোর কথার মাথামুণ্ডু ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না,’ বিরক্ত গলায় বলল জিমি। ‘গোলকধাঁধায় না ঘুরিয়ে এবার সরাসরি কথা বল, ভাই!’

‘আরেকটা এয়ারস্ট্রিপ আছে, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস,’ মিটিমিটি হাসল অয়ন। ‘এমন একটা, যেখানে ভুলেও কেউ যায় না।’

এতক্ষণে ওর কথার অর্থ বুঝতে পারল বাকিরা।

হতভম্ব গলায় জিমি বলল, ‘হায় ঈশ্বর! তার মানে...’

হর্নের শব্দে বাক্যটায় ছেদ পড়ল। পেছনে তাকিয়ে ওরা দেখল, গাড়ি নিয়ে এসে পড়েছে ওয়েবার। জানালা দিয়ে মাথা বের করে জানতে চাইল, ‘এই যে...কাজ শেষ তোমাদের?’

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল অয়ন। ‘আপনার?’

‘নাহ্, যে লোকের কাছে গিয়েছিলাম, তাকে পাইনি। আজকের সব কাজ বাতিল করতে হলো। এসো, পৌঁছে দিই তোমাদের।’

‘আমরা তো এয়ারপোর্টে যাচ্ছি না,’ অয়ন বলল।

‘তাহলে?’

জবাবটা শুনে সাংবাদিকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। কারণ, অয়ন বলল, ‘আমরা যাব এম্পটি আইল্যান্ডে।’

চৌদ্দ

'এম্পটি আইল্যান্ডে যেতে চাও তোমরা?' বিস্ময় ফুটল ওয়েবারের কণ্ঠে। 'এক্ষুনি?'

একযোগে মাথা ঝাঁকাল তিন বন্ধু।

'কীভাবে যেতে হয়, বলতে পারেন?' অয়ন জিজ্ঞাসা করল।

'বোট লাগবে,' বলল ওয়েবার। 'এ ছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই। আমিও যাইনি কখনো। কাজেই কতক্ষণ লাগবে বলতে পারছি না।'

'বোট কোথায় পাব?' জানতে চাইল জিমি।

'ডকে; আর কোথায়?' ওয়েবার বলল। 'ডক চেনো তোমরা?'

মাথা নাড়ল তিনজন।

'হুঁ, সে নাহয় চিনিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু বোট ভাড়া করতে তো টাকা লাগবে। তোমাদের পকেটে কত আছে?'

'খুব সামান্য,' মুখ কালো হয়ে গেছে অয়নের।

'বলো কী! তাহলে যাবে কেমন করে?'

'কেন, আপনি আছেন কী করতে?' সকৌতুক বলল রিয়া।

'তাহলে সাফ সাফ আমার সাহায্য চাইছ না কেন?'

'টাকা চাইতে লজ্জা করছে তো...' মিনমিন করে বলল অয়ন।

'ঠিক আছে, টাকা নিতে হবে না,' হাসল ওয়েবার। 'তার চেয়ে বরং আমার বোটটাই নিয়ে যাও তোমরা।'

'বোট!' অবাক হলো তিন বন্ধু। 'আপনার বোট আছে?'

'বোট মানে, ভাড়া করা বোট,' বলল ওয়েবার। 'আমি মালিক না। সাগর থেকে দ্বীপের ছবি তোলার জন্য ভাড়া করেছি। মাঝেমধ্যে ওটায় চড়ে ঘুরেও বেড়াই। দারুণ লাগে।'

'কীভাবে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে...' রিয়ার কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা।

'রাখো, রাখো,' তাড়াতাড়ি বলল সাংবাদিক। 'বোটটা কে চালাবে, তা আগে ঠিক করো।'

'বোট চালানোর টুকটাক অভিজ্ঞতা আছে আমাদের,' বলল জিমি। 'আশা করি অসুবিধা হবে না।'

'ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে আবার চালু করতে পারবে?'

'বন্ধ হবে কেন?'

'বেশি পয়সা খরচ করতে চাইনি, তাই পুরোনো একটা বোট ভাড়া করেছি। ইঞ্জিনের অবস্থা সঙিন...মাঝেমধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন আবার ঠিক করে নিতে হয়।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল তিন বন্ধু। 'এটা একটা সমস্যা বটে,' স্বীকার করল অয়ন। 'ইঞ্জিনের ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না আমরা।'

'তাহলে?'

'ইয়ে...' কাঁচুমাচু মুখে বলল রিয়া, 'বলছিলাম কী...'

উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল সাংবাদিক। বলল, 'দেখতেই পাচ্ছি, পদে পদে আমার সাহায্য দরকার তোমাদের। বোট চালানোর জন্য আমাকেও যেতে হবে, এ-ই তো?'

'খুব ভালো হয়...'

'ঠিক আছে, আবেদন মঞ্জুর করা হলো। এমনিতেও তো আজকের কাজ বাতিল হয়েই গেছে। তোমাদের সঙ্গে হয়তো সময়টা ভালোই কাটবে। এসো, গাড়িতে ওঠো।'

খুশিতে নেচে উঠল ওরা। গাড়িতে উঠেই অয়ন বলল, 'আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।'

'থাক, থাক, কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না,' দুষ্টুমিমাখা কণ্ঠে বলল ওয়েবার। 'ভেবেছ এমনি এমনি যেতে রাজি হয়েছি? গরম একটা খবরের গন্ধ পাচ্ছি, বুঝলে? নাকি আমার আন্দাজ ভুল?'

'না, ঠিকই অনুমান করেছেন,' বলল অয়ন।

'কী আছে ওখানে?'

'এক্ষুনি ফাঁস করতে চাই না। আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। আগে যাই, তারপর দেখা যাবে।'

একটু পরই ডকের দেখা পেল ওরা, তবে সেখানে গাড়ি ঢোকাল না সাংবাদিক, পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল। রিয়ার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে জানাল, বোটটা ডকে রাখেনি, ওখানে জায়গা হয় না।

আরও কয়েক মিনিট পর রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল ওয়েবার, স্টার্ট বন্ধ করে নামল; দেখাদেখি বাকিরাও। রাস্তাটা সাগরপাড়েই, একটু উঁচুতে। ঢালে ছোট-বড় গাছগাছালির সমাবেশ। গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোতে শুরু করল ওরা।

'থাক, থাক, কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না,' দুষ্টুমিমাখা কণ্ঠে বলল ওয়েবার। 'ভেবেছ এমনি এমনি যেতে রাজি হয়েছি? গরম একটা খবরের গন্ধ পাচ্ছি, বুঝলে? নাকি আমার আন্দাজ ভুল?'

খানিক পরই পানিতে ভাসমান একটা ছোট বোট নজরে এল ওদের, দড়ি দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা। রাস্তা থেকে বোটটা দেখাই যায় না।

'উঠে পড়ো,' নির্দেশ দিল ওয়েবার।

বোটে চড়ল গোয়েন্দারা। দড়ি খুলে সেটাকে সামান্য গভীর পানিতে নিয়ে গেল সাংবাদিক, তারপর আউটবোর্ড ইঞ্জিনটা পানিতে নামাল। স্টার্ট দিতেই সরোষ গর্জে উঠল প্রপেলার, বনবন করে পানি কেটে ঘুরতে লাগল। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল বোটটা।

'ইয়াহু!' খুশিতে চেঁচাল জিমি। খুব মজা পাচ্ছে।

ধীরে ধীরে গতি বাড়ল। সাগরের ছুটে আসা ঢেউ অগ্রাহ্য করে তিরের মতো ছুটে চলল বোটটা এম্পটি আইল্যান্ডের দিকে।

ঠিক আধঘণ্টা পর গন্তব্যে পৌঁছে গেল ওরা। ঘ্যাঁচ করে দ্বীপের তীরের বালুতে আটকাল বোটের তলা। দড়ি হাতে লাফ দিয়ে নামল জিমি।

ইঞ্জিন নিউট্রাল অবস্থায় ছিল, এবার স্টার্ট বন্ধ করে ওয়েবার বলল, 'দেখো, দড়ি বাঁধার মতো কিছু পাওয়া যায় কি না।'

'আমরা দেখছি,' বলে অয়ন আর রিয়াও নেমে পড়ল।

খানিক পর খুঁজে-পেতে একটা শক্ত গাছের ডাল নিয়ে এল অয়ন। সেটাকে খুঁটির মতো বালুতে পুঁতে বোটটা বাঁধল ওরা।

'চলবে,' দেখে বলল ওয়েবার। 'ভাটার সময় খুব বেশি টান না পড়লে ভয় নেই।'

চারপাশে নজর বোলাল অয়ন। রিয়া এখনো খুঁটি

খুঁজছে, ফেরেনি। ছোট্ট সৈকতটা পার হয়েই শুরু হয়েছে ঘাসের জঙ্গল। ছোটখাটো ঘাস নয়, একেকটার ডগা বুকসমান উঁচু। পুরো দ্বীপটাকেই ঢেকে রেখেছে এই ঘাস। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো বড় গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আগাছার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওগুলো যে কীভাবে মাটি থেকে খাবার আহরণ করছে, সেটাই আশ্চর্য। দূরে একটা ন্যাড়া টিলার মাথা দেখা গেল।

'ভুল হয়েছে,' জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল অয়ন। 'এমন জানলে ছুরিটুরি কিছু নিয়ে আসতাম। পায়ে মাড়িয়ে এগোনো সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

হঠাৎ রিয়ার ডাক শোনা গেল।

'অয়ন! জিমি! এদিকে এসো!'

শব্দের উৎস লক্ষ করে এগোল বাকিরা। খানিক পরই রিয়াকে দেখা গেল। ঘাসের জঙ্গলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু যাওয়ার পর ওরাও জিনিসটা দেখতে পেল।

জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে একটা পরিষ্কার পথ! দুপাশের ঘাসগুলো দেখে মনে হচ্ছে, ধারালো কিছু দিয়ে কেটে পথটা তৈরি করা হয়েছে। মাটিতে ফুটে আছে পায়ের ছাপ।

'ইন্টারেস্টিং!' বলল অয়ন। 'এম্পটি আইল্যান্ডে কেউ আসে না, কথাটা দেখা যাচ্ছে সত্যি নয়।'

'কে তৈরি করল এটা?' ওয়েবারের কণ্ঠে পরিষ্কার বিস্ময়।

'সেটা বলা মুশকিল,' অয়ন বলল। 'তবে পথটা কোথায় গেছে, তা আমরা দেখতে পারি। আসুন।'

হাঁটা পথটা ধরে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওরা।

দশ মিনিটের মতো লাগল, তারপরই সরু একটা এয়ারস্ট্রিপের ওপর উঠে এল দলটা।

'মাই গড!' বিস্মিত গলায় বলল ওয়েবার। 'এখানে এয়ারস্ট্রিপ এল কোত্থেকে?' ক্যামেরা চোখের সামনে ধরে ছবি তুলতে শুরু করল সে।

তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখল অয়ন। ছোট্ট টিলাটার ঠিক পাশে পৌঁছেছে ওরা। এয়ারস্ট্রিপটার একটা প্রান্ত চলে গেছে টিলার ভেতরে একটা বড় গুহায়। না, গুহা তো নয়। ভালো করে তাকাতেই বুঝল, ওটা আসলে হ্যাঙ্গার। টিলা কেটে প্লেন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এয়ারফোর্সের লোকেরা ভালোই কষ্ট করেছিল।

গুহার ভেতরটা অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল অয়ন। বুক অজানা উত্তেজনায় ঢিবঢিব করছে। কী দেখতে পাবে কে জানে? ওকে অনুসরণ করছে জিমি আর রিয়া। ওয়েবার এখনো বাইরে ছবি তুলছে।

গুহায় ঢুকেই কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল অয়ন। হাত দিয়ে দেখল, একটা লোহার বার মেঝে থেকে ফুট তিনেক ওপরে আড়াআড়িভাবে ফিট করে রাখা হয়েছে, অনেকটা রেলক্রসিংয়ের মতো। কালো রং করা, আবছা আলোয় ভালো দেখা যায় না। জিমি আর রিয়াকে সাবধান করার সময় পেল না, ওরাও এসে ধাক্কা খেল।

'ধ্যাত্তেরি!' নিচু স্বরে বলে উঠল জিমি।

লোহার বারটা টপকে গুহার আরও ভেতরে ঢুকল ওরা। আবছা আলোয় ক্যানভাসে ঢাকা একটা বড় আকৃতি দেখতে পেল।

'কী ওটা?' ফিসফিসিয়ে বলল রিয়া।

পেছনে পায়ের শব্দ, উল্টো ঘুরে ওয়েবারকে গুহায় ঢুকতে দেখল ওরা। বারটার ব্যাপারে তাকে সাবধান করতে যাচ্ছিল অয়ন, তবে তার প্রয়োজন হলো না। হাত বাড়িয়ে ওটা কোথায় আছে দেখে নিল সে, তারপর একলাফে এপারে চলে এল।

'কিছুই তো দেখা যায় না,' কাছাকাছি এসে বলল সে।

'আলোর ব্যবস্থা থাকতে বাধ্য,' অয়ন বলল। 'দেখা দরকার। কারও কাছে ম্যাচ-ট্যাচ আছে?'

'আমার কাছে টর্চলাইট আছে,' বলল ওয়েবার।

'তাহলে তো আরও ভালো,' বলল অয়ন। 'দিন।'

কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা টর্চ বের করে ওর হাতে দিল সাংবাদিক। সেটা জ্বেলে হ্যাঙ্গারটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ওরা। এককোণে হঠাৎ একটা পুরোনো জেনারেটর দেখতে পেল।

'জেনারেটর!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রিয়া।

'চলে?' জিজ্ঞাসা করল জিমি।

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?' বলে এগিয়ে গেল ওয়েবার।

যন্ত্রটা নিয়ে কয়েক মিনিট খুটখাট করল সে। তারপর আচমকা একটা রশি ধরে সজোর টান দিতেই ঘড়ঘড় করে চালু হয়ে গেল জেনারেটর। বিদ্যুতের লোড নিতে ওটাকে খানিক সময় দিল ওয়েবার, পরে সুইচ অন করতেই পুরো হ্যাঙ্গার উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। চোখ তুলে মাথার ওপর অনেকগুলো বৈদ্যুতিক বাতি দেখতে পেল ওরা।

'বাহ্! সব ফকফকা!' বলে উঠল জিমি।

'এগুলো সব যদি এয়ারফোর্সের আমলের হয়ে থাকে, তো নিজের নাম পাল্টে ফেলব আমি,' বিড়বিড় করল অয়ন।

'পর্দা উন্মোচিত হবে নাকি?' বড় আকৃতিটাকে ঢেকে রাখা ক্যানভাসের দুপ্রান্ত ধরে রেখেছে জিমি আর রিয়া।

'নিশ্চয়ই!' অয়ন মাথা ঝাঁকাল।

টান দিয়ে ক্যানভাস সরাতে শুরু করল দুই বন্ধু।

সরছে ওটা।

নিচের জিনিসটা বেরিয়ে আসছে...একটু একটু করে।

পুরোটা বেরিয়ে পড়তেই স্থবির হয়ে গেল সবাই।

একটা ফাইটার—পুরোনো, ভাঙাচোরা, ধ্বংসাবশেষের মতো!

অভ্রভেদী!

চলবে

অলংকরণ : **আরাফাত করিম**



ইন্দোনেশিয়ার লোকগল্প

রূপান্তর : নিজাম বিশ্বাস



শতসহস্র দ্বীপ নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ ইন্দোনেশিয়া। দেশটির দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে আছে অজস্র লোকগল্প। ইন্দোনেশিয়ার ডাক বিভাগ সেই সব গল্পের মধ্য থেকে তুমুল জনপ্রিয় ৩৬টি গল্প নিয়ে প্রকাশ করেছে মোট ১৮৬টি ডাকটিকিট ও ৯টি স্যুভেনির শিট। ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ডাকটিকিটগুলো মোট ৯টি পর্বে প্রকাশিত হয়। তার মধ্য থেকে 'সোনালি শামুক ও ডাইনি বুড়ি' ও 'অশুভ পাথরের মায়াবী ডাক' গল্প দুটি ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর করা হলো।

সোনালি শামুক ও ডাইনি বুড়ি

জাভা দ্বীপে এক রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজপুত্র রাদেন ও রাজবধূ লিমারানের বেশ সুখে দিন কেটে যাচ্ছিল। একদিন প্রাসাদের বাগানে পায়চারি করছিল রাজবধূ লিমারান। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, ঘাসের ওপর একটা শামুক ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। শামুকটি দেখতে ভীষণ বিশ্রী! বমি চলে এল রাজবধূর। বাগানের পাশ ঘেঁষে বয়ে চলা নদীতে সে শামুকটিকে ছুড়ে মারল। কিন্তু সেটা শামুক ছিল না, ছিল এক ডাইনি বুড়ি। যে ডাইনি বুড়ি যখন-তখন যেকোনো রূপ ধারণ করতে পারত। রাজবাগানে আজ সে শামুকের রূপ ধরে হাঁটছিল। এর কিছুই রাজবধূ জানত না।

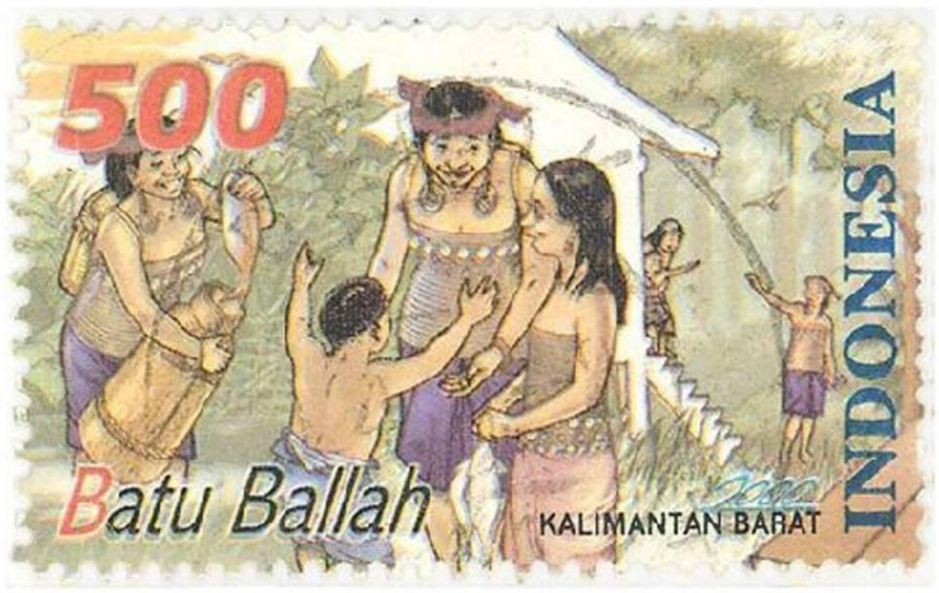
নদীর পানিতে শামুকরূপী ডাইনিটি টুপ করে ডুবে গেল। তার নাকে-মুখে ঢুকে পড়ল পানি। অল্প সময়ের মধ্যেই ডাইনি শামুকের রূপ ছেড়ে তার আসল মূর্তি ধারণ করল। রাজবধূর ওপর ভীষণ চটে গেল সে। রেগেমেগে চলে এল প্রাসাদের বাগানে। লিমারান তখনো সেই বাগানে পায়চারি করছিল। হঠাৎ অমন বিকট ডাইনিকে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠল সে। চিৎকার করার আগেই ডাইনি বুড়ি মন্ত্র পড়ে রাজবধূকে একটা সোনালি রঙের শামুক বানিয়ে ফেলল। রাজবধূ যেভাবে ডাইনিকে নদীতে ছুড়ে মেরেছিল, ডাইনিও তেমনি রাজবধূকে শামুক বানিয়ে নদীতে ছুড়ে ফেলল।

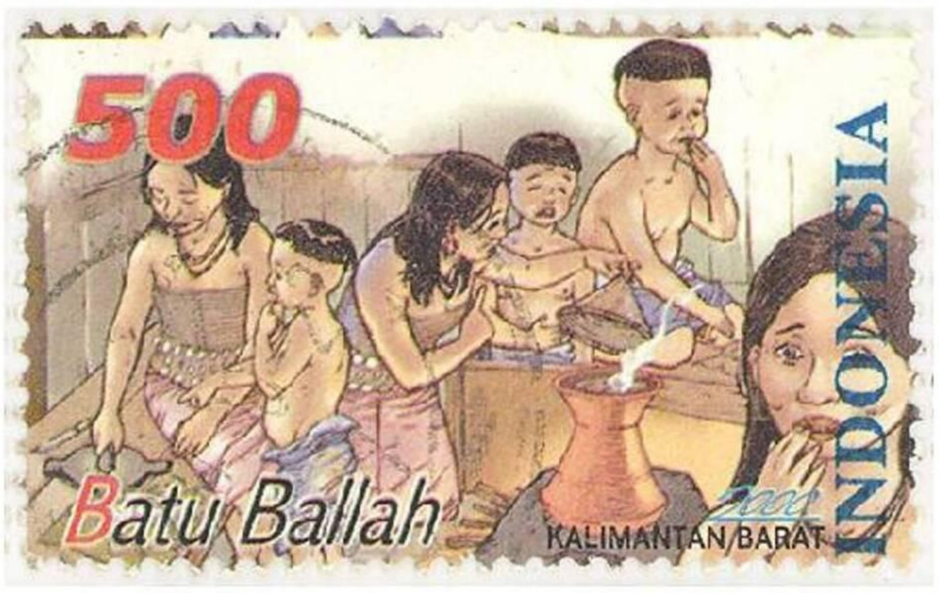
নদীতে ছিল তখন ভরা জোয়ার। স্রোতের টানে সোনালি শামুকটি অনেক দূর ভেসে গেল। রাজপ্রাসাদ থেকে বেশ কিছু দূরে সেই নদীর ধারে তখন এক বুড়ি মাছ ধরছিল। শামুকটি এসে তার জালে আটকে গেল। বাহ, কী সুন্দর একটি শামুক! বুড়ি তার জীবনে কখনো এমন সোনালি রঙের শামুক দেখেনি। সে মাছের সঙ্গে শামুকটিকেও বাড়িতে নিয়ে এল।

বুড়ি সারা দিন মাছ ধরে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন ঘুম থেকে উঠে সে দেখল, তার অগোছালো ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর টেবিলে সাজানো আছে বাহারি সব খাবার। এসব দেখে সে বিস্মিত হয়ে গেল; এ কাজ কে করতে পারে? সে ছাড়া তো এ ঘরে আর কেউ নেই। পরদিন সকালেও বুড়ি দেখল একই অবস্থা। তার ঘর সুন্দর করে গোছানো, পরিচ্ছন্ন আর টেবিলে খাবার রাখা। এভাবে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল। কে এই কাজ করে, তাকে দেখার জন্য বুড়ির কৌতূহল বেড়ে গেল! তাই একরাতে বুড়ি ঘুমের ভান করে জেগে রইল। মাঝরাতে হঠাৎ সে দেখল, সেদিন নদী থেকে যে সোনালি রঙের শামুক ধরে এনেছিল, সেটা এক সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করেছে। সে বুড়ির ঘর পরিষ্কার করছে, মেঝে ধুয়ে চকচকে বানাচ্ছে, রান্নাঘরে গিয়ে চুলায় হাঁড়ি বসাচ্ছে। বুড়ি নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে ধীরে ধীরে তার পেছনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি, সুন্দরী?'

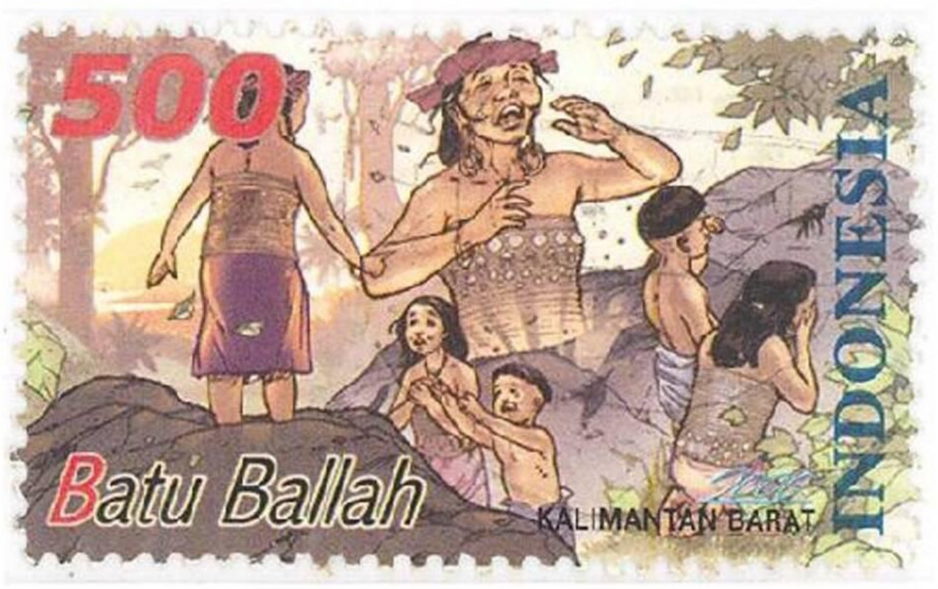
বুড়ির কণ্ঠ শুনে লিমারান চমকে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বুড়িকে জানাল তার আসল পরিচয় যে সে এই রাজ্যের রাজবধূ। এক দুষ্ট ডাইনি কীভাবে তাকে শামুক বানিয়ে নদীতে ছুড়ে মেরেছে—সবকিছু বুড়িকে বলল। রাজবধূ বুড়িকে আরও জানাল যে সে শুধু রাতেই মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে, আর সারা দিন তাকে শামুক হয়ে পড়ে থাকতে হয়।

সব কথা শুনে বুড়ি জানতে চাইল, কীভাবে রাজবধূকে আগের রূপে ফেরানো যায়। তখন রাজবধূ লিমারান বলল, একমাত্র পবিত্র মন্ত্র যদি তার কানে এসে পৌঁছায়, তাহলেই ডাইনির মন্ত্রের শক্তি কমে যাবে। তারপর সে শামুক থেকে আবার মানুষ হয়ে উঠবে।











পরদিন বুড়ি ছুটে গেল রাজপ্রাসাদে। এদিকে রাজবধূ লিমারান নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে রাজপ্রাসাদে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সবাই পাগলের মতো এদিক-সেদিক রাজবধূকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময় বুড়ি এসে রাজপুত্র রাদেনকে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর খবর দিল। রাদেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। পবিত্র মন্ত্রের জোরে লিমারানকে ফিরে পাওয়া যাবে শুনে সে দেবতার কাছে প্রার্থনা করল সেই পবিত্র মন্ত্রের জন্য। প্রার্থনা চলল বেশ কয়েক দিন ধরে। অবশেষে রাজপুত্রের প্রার্থনা সফল হলো। দেবতা তাকে বলে দিলেন সেই পবিত্র মন্ত্র। অমনি রাজপুত্র বুড়ি মহিলার বাড়িতে ছুটে গেল। সোনালি শামুকের কাছে এসে মন্ত্র উচ্চারণ করল। পবিত্র মন্ত্রের জোরে ডাইনির শয়তানি মন্ত্রের জোর কমে গেল এবং শামুকটি রাজবধূ লিমারানে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তারপর রাজপুত্রের সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে এল সে। কৃতজ্ঞতাবশত বুড়িকেও তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে এল। তারপর বাকি জীবন তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকল।

অশুভ পাথরের মায়াবী ডাক

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করত মাক তানজুং নামের এক বিধবা নারী। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর বড় মেয়ে মেলুর আর ছোট ছেলে পেকানকে নিয়ে তার কাটছিল অভাবের সংসার। কখনো কাপড় বুনে আবার কখনো মাছ ধরে কোনোমতে সে সংসারের হাল ধরে রেখেছিল। তানজুং সব সময় তার স্বামীর অভাব ভীষণ অনুভব করত। অসুস্থ শরীরেও দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছিল শুধু সন্তানদের কথা ভেবে। স্বামীর মৃত্যুর পর তানজুংয়ের শখ-আহ্লাদ বলে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আহা, কত দিন হয়ে গেছে তেম্বাকুল মাছ খায়নি সে!

অন্য সব দিনের মতো সেদিনও তানজুং নদীতে মাছ ধরছিল। হঠাৎ পেয়ে গেল সেই তেম্বাকুল মাছ! খুশির সীমা রইল না তার। আনন্দে চিৎকার করে উঠল সে। খোদার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তারপর বাঁশের ঝুড়িতে করে মাছটি বাড়িতে নিয়ে এল। কাটার পর দেখল যে মাছের পেটে ডিম। তেম্বাকুল মাছের ডিম তানজুংয়ের ভীষণ প্রিয়। তাই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

সুগন্ধি মসলার সঙ্গে মাছের ডিমগুলো চুলার ওপর বুদ্‌বুদ করে নাচছিল আর বাতাসে ছড়াচ্ছিল সুস্বাদু ঘ্রাণ। তানজুংয়ের আর তর সইছিল না, কখন যে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এই ডিম সে খেতে বসবে। স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম তেম্বাকুল মাছের ডিম খাবে। এই ভেবে তার জিবে জল এসে গেল।

রান্নাবান্না শেষ করে তানজুং তার মেয়ে মেলুরকে ডেকে বলল, 'মাছের ডিমগুলো তিন ভাগ করে রেখে গেলাম, এই দুই ভাগ তোমাদের। আর এই ভাগ আমার।' তারপর তানজুং গোসল করতে গেল। মেলুর আর পেকান দুজনই ছিল ভীষণ ক্ষুধার্ত! মা ফিরে আসা অবধি অপেক্ষা করতে পারল না। তারা দুজন খেতে বসে গেল। ছোট্ট পেকান একটু বেশিই ক্ষুধার্ত ছিল। নিজের ভাগের তেম্বাকুল মাছের ডিম সে গোগ্রাসে খেয়ে শেষ করে ফেলল। তাতে পেট ভরেনি তার। আরও ডিম চাই। মেলুর তার প্লেট থেকে কিছু ডিম তুলে দিল ভাইয়ের থালায়। পেকান সেই ডিমও নিমেষের মধ্যেই খেয়ে ফেলল। পরে আরও চাইল সে। কিন্তু ততক্ষণে মায়ের ভাগেরটুকু ছাড়া আর কোনো ডিম অবশিষ্ট নেই। কিন্তু পেকান তা মানতেই চায় না। সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল, তারপর মেঝেতে গড়াগড়ি

দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। কিছুতেই শান্ত করা গেল না তাকে। মেলুর তাই বাধ্য হয়ে মায়ের ভাগের ডিমও তুলে দিল ছোট ভাইয়ের থালায়। সঙ্গে সঙ্গে সেটাও সাবাড় করে ফেলল পেকান। তারপর শান্ত হলো।

তানজুং গোসল সেরে ফিরে এল। তারপর খেতে গিয়ে দেখল, তার জন্য আর একটুও ডিম অবশিষ্ট নেই। তার ছেলে-মেয়ে সবটুকু চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছে। 'তোমরা সব ডিম খেয়ে ফেলেছ, না?' রাগে-দুঃখে তানজুং তার ছেলে-মেয়েকে বকল। মেলুর তার মায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করল। ডিম খাওয়ার জন্য পেকানের কান্নাকাটির কথা মাকে জানাল। পেকানকে তা ছাড়া ঠান্ডা করাই যাচ্ছিল না।

মাক তানজুং বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। তবু মনে ভীষণ দুঃখ পেল সে। অনেক কষ্টে চোখের পানি ধরে রাখল। আহা, কত দিন পর তেম্বাকুল মাছের ডিম খাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তার! তারপর তানজুং আর একটাও কথা বলল না। খাবার না খেয়ে ক্ষুধাপেটেই বিছানায় চলে গেল।

ওই গ্রামের পাশেই ছিল এক গভীর জঙ্গল। সেই জঙ্গলে ছিল বিশাল এক পাথর। ভারি আশ্চর্য পাথর। পাথরের ভেতরে ছিল এক গোপন গুহা। কারও মনে কোনো দুঃখ থাকলে তাকে মায়াবী সুরে ডাকত পাথরটি। সেই মায়াবী ডাকে দুঃখী মানুষটি পাথরের সামনে এসে দাঁড়ালে পাথরটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত। তারপর সে পাথরের ভেতর ঢুকে পড়লে আর কখনোই বের হতে পারত না। চিরতরে হারিয়ে যেত।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাক তানজুং বারবার সেই তেম্বাকুল ডিমের কথাই ভাবতে থাকে। ছেলে-মেয়ের আচরণে সে খুব দুঃখ পেয়েছে। দুঃখী তানজুংকে বনের সেই অশুভ পাথর মায়াবী সুরে ডাকতে শুরু করল। কিন্তু সে নিজেকে বারবার সংযত করছিল। অবশেষে মাঝরাতে তানজুংয়ের ঘুম ভেঙে গেল। পাথরের ডাকে সাড়া দিয়ে সে জঙ্গলের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

হাঁটতে হাঁটতে তানজুং এসে থামল সেই অশুভ পাথরের কাছে। পাথরটি তানজুংকে কাছে আসার জন্য ইশারা করল। তানজুং নিশিগ্রস্তের মতো হেঁটে গেল পাথরের কাছে। যখন খুব কাছে পৌঁছাল, তখন পাথরের মুখ খুলে গেল। তানজুং সম্মোহিত হয়ে পাথরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। তার গায়ে জড়ানো চাদর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তানজুং যখন পুরোপুরি ভেতরে সেঁধিয়ে গেল, পাথরের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তানজুং পাথরের ভেতরে চিরতরে হারিয়ে গেল। পাথরের কাছে পড়ে রইল তার পায়ের ছাপ আর গায়ের চাদর।

সকাল হয়ে গেল। মেলুর ঘুম থেকে উঠে দেখল, তাদের মা বিছানায় নেই। মাকে আশপাশে অনেক খুঁজল। কোথাও তার হদিস পাওয়া গেল না। দ্রুত সে ছোট ভাই পেকানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। 'ওঠো, জলদি ওঠো, মাকে খুঁজে পাচ্ছি না।' পেকান অবাক হয়ে চোখ খুলে তাকাল। তারপর দুই ভাই-বোন মাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। মায়ের পায়ের ছাপ পড়ে আছে মাটিতে। সেই ছাপ ধরে একসময় জঙ্গলের কাছাকাছি চলে এল তারা। জঙ্গলের ভেতরে চলে গেছে সেই ছাপ।

পায়ের ছাপ গুনে গুনে অবশেষে সেই আশ্চর্য পাথরের কাছে এসে থামল দুই ভাই-বোন। পাথরের কাছে তাদের মায়ের গায়ের চাদরটি পড়ে ছিল। অনেকক্ষণ ধরে তারা পাথরের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু পাথরের মুখ আর খুললই না। তারা পাথরের শরীরে আছড়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু তাদের মা আর ফিরে এল না।

জন্মদিন

তোমাদের অনেকের জন্মদিন সেপ্টেম্বর মাসে। এ মাসে যাদের জন্মদিন, তাদের সবাইকে কিশোর আলোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আশা করি, তোমাদের জন্মদিন ভালো কাটবে। ভালো থেকো তোমরা।

এ মাসে যাদের জন্মদিন—

২ সেপ্টেম্বর
নুহা
চতুর্থ শ্রেণি, বিএএফ শাহীন হাজী আশ্রাফ আলী স্কুল, ঢাকা

৩ সেপ্টেম্বর
তাসমি সোহা
ষষ্ঠ শ্রেণি, আদর্শ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ফরিদপুর

৫ সেপ্টেম্বর
ইয়াছা মাকনুন লামিয়া
রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর

৬ সেপ্টেম্বর
জান্নাতুল মাওয়া
দশম শ্রেণি, মুক্তিযোদ্ধা মসিউর রহমান মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঝিনাইদ

৮ সেপ্টেম্বর
মিথিলা
নবম শ্রেণি, পৌর বালিকা বিদ্যানিকেতন, ফেনী

৯ সেপ্টেম্বর
জেরিন মাশিয়াত
নওগাঁ সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুল, নওগাঁ

১১ সেপ্টেম্বর
মো. নিরব রেজা
অষ্টম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর

১২ সেপ্টেম্বর
সুমাইয়া তাবাসসুম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩ সেপ্টেম্বর
রেদুয়ান ইসলাম রুমান
অষ্টম শ্রেণি, পঞ্চগড় বিষ্ণু প্রসাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, পঞ্চগড়

১৬ সেপ্টেম্বর
শাফায়েত মাহমুদ
অষ্টম শ্রেণি, কোরপাই কাকিয়ারচর ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা, কুমিল্লা

১৭ সেপ্টেম্বর
সুমাইয়া আমিন
সপ্তম শ্রেণি, নান্দাইল পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

২৪ সেপ্টেম্বর
জেরিন তাসনিম
অষ্টম শ্রেণি, ভেড়ামারা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ভেড়ামারা

২৬ সেপ্টেম্বর
আরশাদ ধীমান কবীর
চতুর্থ শ্রেণি, আনন্দপাঠ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

২৭ সেপ্টেম্বর
রাইয়ান নূর চৌধুরী
পঞ্চম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

২৯ সেপ্টেম্বর
প্রাচুর্য দাস রুদ্র

তোমাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। শুভ জন্মদিন।

আগাথা ক্রিস্টি : কুইন অব মিস্ট্রি

নাজিফা তাজনূর



গোয়েন্দা, কিংবা ডিটেকটিভ—শব্দগুলো শুনলেই হয়তো তোমাদের চোখে ভেসে ওঠে একজন লম্বা-চওড়া ঝকঝকে চেহারার টগবগে তরুণ—তিনি যে রকম বুদ্ধিমান, তেমনই সাহসী আর ঠিক তেমনই মারামারি-পটু।

মগজাস্ত্র কিংবা হাতের অস্ত্র—যখন যেখানে যেটা দরকার, সেটি খেলিয়ে কখনো ফেলুদা, কখনো শার্লক হোমস, কখনো ব্যোমকেশ হয়ে গোয়েন্দারা আমাদের নিয়ে যান রহস্যে মোড়া অ্যাডভেঞ্চারের জগতে। তাঁরা বুদ্ধিতে শাণ দিয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর রহস্য যেমন সমাধান করে ফেলেন, তেমনি প্রয়োজনে ঢিসুমঢাসুম করে প্রতিপক্ষকে কাতও করে দিতে পারেন।

কিন্তু কখনো কি ভেবেছ, আমাদের দাদি-নানিদের মতো, রূপকথার গল্প শোনানো, ভাঁজ পড়া চামড়ার ফোকলা দাঁতের মিষ্টি একজন বয়স্ক মানুষও তুখোড় গোয়েন্দা হতে পারেন?

একজন ভেবেছিলেন। আগাথা ক্রিস্টি।

ভেবেছিলেন বলেই লিখতে পেরেছিলেন মিস মার্পলকে। মিস মার্পল লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে হেঁটে যাওয়া এক মিষ্টি বৃদ্ধা। ষাটের কোঠা পার করেছেন। থাকেন সেন্ট মেরি মিড গ্রামে। শুধু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা আর ক্ষুরধার বুদ্ধিকে ব্যবহার করে খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে সমাধান করে ফেলেন জটিল সব রহস্যের। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বড় কর্তারাও শরণ নেন তাঁর।

আগাথা ক্রিস্টির আরও একটি সৃষ্টি বেলজিয়ান ডিটেকটিভ এরকুল পোয়ারো। শার্লক হোমসের পর বিশ্বে সবচেয়ে বিখ্যাত গোয়েন্দা বোধ হয় ইনিই। শতাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে এরকুল পোয়ারো সিরিজের প্রায় সব উপন্যাস।

সাধারণত কোনো লেখককে আমরা তাঁর একটি সৃষ্টি দিয়ে চিনি। যেমন, আর্থার কোনান ডয়েলকে চিনি শার্লক হোমসের জন্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিনি তাঁর চিরায়ত সৃষ্টি টেনিদার বরাতে। আগাথা ক্রিস্টিই বোধ হয় একমাত্র লেখক, যাঁর একাধিক চরিত্রের সব কটিই বিশ্বব্যাপী অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ক্রিস্টির বই এখন পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে প্রায় দুই বিলিয়ন কপি। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তালিকায় সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া বইয়ের তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন শুধু শেক্সপিয়ার।

রহস্য গল্প যাঁরা লেখেন, বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় তাঁদের নিজেদের জীবন হয় রসকষহীন আর অ্যাডভেঞ্চারবিহীন। এদিক থেকেও আগাথা ক্রিস্টি বেশ ব্যতিক্রম। তাঁর আর্কিওলজিস্ট স্বামীর সঙ্গে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন ইরাক, মিসর আর সিরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক একেকটা স্থাপনায়। সকালবেলায় লিখতেন আর দিনের বাকি সময়টা পুরোদস্তুর প্রত্নতত্ত্ব দলের সদস্য হয়ে নেমে পড়তেন কাজে। খনন করে তুলে আনা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ছবি তুলতেন, মাটির তৈরি প্রাচীন তৈজসপত্র রিস্টোর করতেন আর পেপারওয়ার্ক সামলাতেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের পটভূমিতেও তিনি লিখে গেছেন অসংখ্য উপন্যাস।

আগাথা ক্রিস্টি যখন প্রথম লিখতে শুরু করেন, তখন পৃথিবীটা ছিল অন্য রকম। মাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, অভিবাসীদের ঢল ব্রিটেনজুড়ে। ব্রিটিশরা জাতি হিসেবে এমনিই বেশ নাক-উঁচু। আর ইউরোপের দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে একটু চাপা রেষারেষি, সংস্কার আর দ্বেষ তো আছেই। তাই বেলজিয়ান, রুশ, সার্বিয়ান, ফরাসিসহ অনেক



আগাথা ক্রিস্টি

জাতিসত্তার অভিবাসীদের আশ্রয় দিলেও ব্রিটেন তাদের ঠিক আপন করে নিতে পারেনি।

ক্রিস্টি তখন যুদ্ধাহতদের হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবক নার্স হিসেবে কাজ করেন আর মাঝেমধ্যে ছোটগল্প লেখেন—স্বপ্ন নিয়ে, প্যারানরমাল জিনিসপত্র নিয়ে। ছদ্মনামে বিভিন্ন সাময়িকীতেও পাঠান, কিন্তু ছাপা হয় না। একদিন বোনের সঙ্গে বাজি রেখে লিখে ফেললেন একটা গোয়েন্দা উপন্যাস। নার্স হিসেবে অনেক আহত বেলজিয়ান সৈনিকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর। তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বেলজিয়ান এক অবসরপ্রাপ্ত অভিবাসী পুলিশ কর্মকর্তাকে বানালেন তাঁর গল্পের মূল গোয়েন্দা-চরিত্র।

অনেক জায়গা থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর একটা প্রকাশনী অবশেষে উপন্যাসটা ছাপতে রাজি হলো। কিন্তু শর্ত জুড়ে দিল, গল্পের শেষটা একটুখানি বদলাতে হবে। ক্রিস্টি বদলালেনও। ব্যস, ছাপা হলো দ্য মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস। এরকুল পোয়ারোকে নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস।

সেই যে শুরু হলো, তার আর থামাথামি নেই। পাঠকের অনুরোধে, প্রকাশকের তাগাদায় পরপর লিখে গেছেন অসংখ্য উপন্যাস আর গল্প। সৃষ্টি হয়েছে পোয়ারো, মিস মার্পল, টমি আর টুপেন্সের মতো অসংখ্য জনপ্রিয় চরিত্র।

প্রথম বই প্রকাশের ৫৬ বছর পর ১৯৭৩-এ তিনি যখন তাঁর জীবদ্দশায় শেষ প্রকাশিত উপন্যাস *পস্টার্ন অব ফেট* লিখছেন, তখন তাঁর ঝুলিতে ৬৫টি উপন্যাস আর অসংখ্য ছোটগল্প। ম্যারি ওয়েস্টম্যাকট ছদ্মনামে আছে আরও ছয়টি উপন্যাস।

ওই অর্ধশতাব্দীতে পৃথিবী-সমাজ-দেশ সব একেবারে পাল্টে গেছে। পৃথিবী দেখেছে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটেন আর সেই 'যে সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায় না' নেই। রাজতন্ত্র আর শ্রেণিব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা কমতে শুরু করেছে সূচকীয় হারে। প্রযুক্তির দুনিয়ায় আকাশ-পাতাল বদল ঘটেছে। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে পৃথিবীটা হয়ে উঠেছে আরেকটু অস্থির, আরেকটু নড়বড়ে। মানুষের দেখার চোখও বদলে গেছে। এই বিশাল পরিবর্তনের ছাপ পড়েছিল ক্রিস্টির লেখাতেও। তাঁর চরিত্রগুলো আর গল্পের মোড়ও স্থির থাকেনি। তারাও সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে। রহস্যের ঘনঘটায় মোড়ানো হলেও বিশ্বের পাল্টে যেতে থাকা আর্থসামাজিক ইতিহাসের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর লেখায়।

আগাথা ক্রিস্টির জীবনে চমকপ্রদ ঘটনাও কম নেই। একবার বাসায় রাগারাগি করে একটা চিঠি লিখে দুম করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান ক্রিস্টি। চিঠিতে লিখে গিয়েছিলেন ইয়র্কশায়ারে যাওয়ার কথা। কিন্তু দুই দিন পর নিউল্যান্ডস কর্নারের একটা পিকনিক স্পটে তাঁর খালি গাড়ি পাওয়া যায়। গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁর পোশাক আর মেয়াদোত্তীর্ণ ড্রাইভিং লাইসেন্স। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। *নিউইয়র্ক টাইমস* ও *ডেইলি মিরর*-এর প্রথম পৃষ্ঠায় নিখোঁজ সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঘোষণা করা হয় অর্থ পুরস্কার। উদ্ধারে নেমে পড়েন হাজারখানেক পুলিশ কর্মকর্তা, ১৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক আর বেশ কয়েকটি উড়োজাহাজ। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ও আরেক গোয়েন্দা-লেখক ডরোথি এল সায়ার্সও যোগ দিয়েছিলেন ক্রিস্টির উদ্ধার অভিযানে। শেষমেশ নিখোঁজ হওয়ার এগারোতম দিনে ইয়র্কশায়ারের হ্যারোগেটের একটি হোটেলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়।

আগাথা ক্রিস্টির তুলনামূলক কম পরিচিত দুটি চরিত্র টমি আর টুপেন্স। তাদের নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে *এন অর এম?* শিরোনামে একটা বই লিখেছিলেন ক্রিস্টি। বইটি এতই বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সন্দেহজনক তালিকায় নাম উঠে গিয়েছিল তাঁর!

তবে ঔপনিবেশিক আর রক্ষণশীল বলে আগাথা ক্রিস্টির বেশ অপযশও চালু আছে। মাঝেমধ্যেই তাঁর লেখায় অ-ব্রিটিশ চরিত্রগুলোর প্রতি বেশ বৈষম্যের গন্ধ পাওয়া যায়। তার পরও টানটান গল্প আর রোমাঞ্চকর গাঁথুনির লেখাগুলো তাঁর জনপ্রিয়তায় একবিন্দু ভাটা পড়তে দেয়নি।

তুমি যদি এখনো আগাথা ক্রিস্টিকে না পড়ে থাকো, শুরু করতে পারো *দ্য ম্যান ইন দ্য ব্রাউন স্যুট*, এরকুল পোয়ারোকে নিয়ে লেখা *দ্য মার্ডার অব রজার অ্যাকরয়েড*, মিস মার্পলের প্রথম বই *মার্ডার অ্যাট দ্য ভিকারেজ* অথবা ছোটগল্প 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ক্রিসমাস পুডিং' দিয়ে। এরপর তাঁর ৬৬টি উপন্যাস আর ১৪টি গল্প সংকলনের বিশাল সংগ্রহ তো আছেই!

এ মাসের ১৫ তারিখ এই 'কুইন অব মিস্ট্রি'র জন্মদিন। তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা।

অন্যরকম প্রজন্ম উৎসব

সায়েন্স টপার ক্যাম্পেইনের বিজয়ীরা

C_2H_5

কিছুদিন আগেই শেষ হলো অন্যরকম প্রজন্মের "সায়েন্স টপার" ক্যাম্পেইন। আর এখন চলছে "থিওরি মাস্টার" ক্যাম্পেইন। আর সামনে আমরা সবাই মিলে বিজ্ঞান জাদুঘরে যাব। ঘুরতে ঘুরতে বিজ্ঞান শিখব। এভাবেই অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপ সবসময় সরগরম থাকছে নানারকম ইভেন্ট আর ক্যাম্পেইনে।

এবার দেখে নাও সায়েন্স টপার ক্যাম্পেইনের বিজয়ীদের।



আনিশা বিনতে আমির

শ্রেণি- চতুর্থ
সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়



রৌদ্র রায়

শ্রেণি- ষষ্ঠ
কোধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়



তানভীর আহমেদ

শ্রেণি- সপ্তম
আকরান উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ



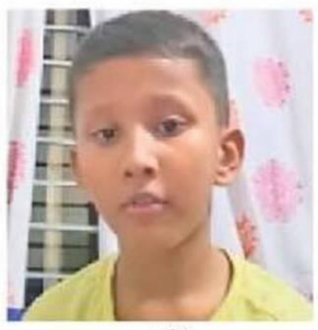
আবু সাফওয়াত হিশাম

শ্রেণি- চতুর্থ
সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়

আগস্ট মাসের অংশগ্রহণকারীরা


ত্বহা


তমান


সাহিল


শিশির


হৃদি


রুশদান


রাজমান

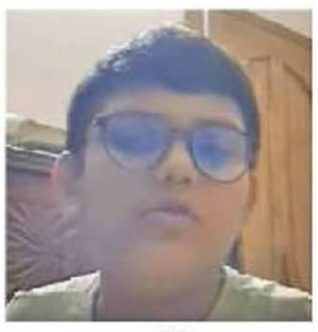

আহনাফ


মিলহান


আজমাইন


আনফাল


অরণি


মুবাশ্বির


আব্দুল্লাহ


দৃশ্য


তানভীর


রাফি


জারিফ


আসওয়াদ


সালিত


মুঈদ


খাদিজা


নুহা


রিধা


শরীফুল


আরহান


শুদ্ধ


জারীর

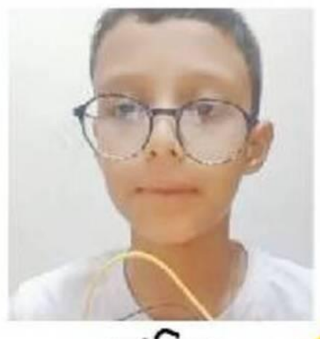

সাফারা


তৌসিফ


হিসাম


মনন


আদিব


ফারিন


জেরিন

অন্যরকম প্রজন্ম ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করো

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে

এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং

bigganbaksho.com

অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স



প্রিয় মনোবন্ধু,
আমি এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন করেছি ঠিকই, কিন্তু ভালো নম্বর পাইনি। আমার বন্ধুরা অনেক ভালো নম্বর পেয়েছে। সবাই বলে, ভালো কলেজে ভর্তি না হলে ভালো ফল হবে না। আমি ওই অনুসারে ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারব না। এমন নয় যে এসএসসিতে আমি পড়াশোনা করিনি। এ জন্য আমার বন্ধুর সংখ্যা ছিল কম। খুব ভালোভাবেই পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আশানুরূপ ফল হয়নি। আমার অনেক বন্ধু, যারা অনেক ঘোরাঘুরি করেছে, আড্ডা দিয়েছে, তারা আমার চেয়ে ভালো ফল করেছে। আমার শুধুই মনে হয়, আমি কী করলাম! গুটিকয় বন্ধু যারা ছিল, তারাও এখন দেখা হলে কথা বলে না। আমার মনে হচ্ছে, আমি ভীষণ বিষণ্ন হয়ে যাচ্ছি। পড়াশোনার আগ্রহ একদমই হারিয়ে ফেলছি। পড়তে ইচ্ছা করে না। শুধু মনে হয়, আমি পড়লেও পারব না। আমার আত্মবিশ্বাস একদম কমে গেছে। বুঝতে পারছি না, কী করব। আমার কী করা উচিত?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

মনোবন্ধু : তুমি এসএসসি পরীক্ষায় সফল হয়েছে। সে জন্য প্রথমেই তোমাকে অভিনন্দন। তবে মনে রাখবে, ফলাফলই সব নয়। নম্বরের চেয়ে তোমার আত্মবিশ্বাস, লক্ষ্য নির্ধারণ ও সঠিক পরিকল্পনা জীবনে সফল হওয়ার জন্য জরুরি। তুমি যদি হতাশ হয়ে পড়ো, তাহলে এসব বিষয় ঠিকমতো হবে না। তাই আত্মবিশ্বাস বাড়াতে অপরের সঙ্গে নিজের তুলনা করা বন্ধ করে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করো। নিজের ইতিবাচক দিকগুলো কাগজে লিখে ফেলো। সামাজিক যোগাযোগ বাড়াও। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো। আর নতুন বন্ধু বানাও। পড়াশোনায় আগ্রহ ফিরে পেতে পড়ার ধরনটা একটু পাল্টাও। গ্রুপ স্টাডি করতে পারো, বইয়ের পাশাপাশি ভিজ্যুয়াল লার্নিংয়ের (ইউটিউব বা ভিডিও দেখে শেখা) সাহায্য নিতে পারো। আর সবার আগে মনের যত্ন নাও। হাঁটাহাঁটি করো। নিজেকে ধন্যবাদ দাও। প্রয়োজনে কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সরাসরি দেখা করে পরামর্শ গ্রহণ করো।

প্রিয় মনোবন্ধু,
আমি এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। আমি সব সময় চাইতাম, আমি যেন একটি সুস্থ পরিবেশে বসবাস করি। কিন্তু পরিবারের ঝামেলার কারণে সেটা পারছি না। আমি অনেক মানসিক চাপে আছি। জানি না, আপনি আমার লেখাটা পড়বেন কি না। কিন্তু দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমার পরিবারের ঝামেলা হলো, আব্বু-আম্মুর ভেতর সামান্য কথা-কাটাকাটি হলে তাঁরা দুজনই ব্যাপারটাকে অনেক উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যান। তাঁরা হাতাহাতি পর্যন্ত করেন। এতে আমার ছোট ভাইবোন অনেক ভীত হয়ে পড়ে। তারা কয়েক দিন মানসিক চাপে থাকে। ভয়ে থাকে। আমি সারাক্ষণ এসব বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকি। আমি একটুও স্বাধীন-সুন্দরভাবে থাকতে পারি না। তাঁরা প্রতিনিয়ত এগুলো করেন। আমি বাধা দিতে গেলে আমার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেন। আমি এগুলো নিতে পারি না। প্লিজ, আমাকে এ থেকে মুক্তির উপায় বলুন। আমি বিষয়টার সমাধান চাই। আব্বুর আবার আমার নানুদের সঙ্গে জায়গাসংক্রান্ত একটা বিষয় নিয়ে ঝামেলা আছে। এটা নিয়েও আম্মুকে কথা শোনান। আমি কী করব এ অবস্থায়? আমি প্রায় রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি এগুলো নিয়ে। মাঝেমধ্যে ভয়ে শরীরে কাঁপুনি ধরে যায়। আমি কী করব? প্লিজ আমাকে একটু সাহায্য করুন। প্লিজ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, এসএসসি পরীক্ষার্থী

মনোবন্ধু : প্রথমেই তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি তোমার ছোট ভাইবোনদের পাশে থাকার চেষ্টা করছ, তাদের নিয়ে চিন্তা করছ। এটি তোমার দায়িত্ববোধ আর তাদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ। এটি তোমার অনন্য মানবিক গুণ, তোমার শক্তি। মা-বাবা যদি চান, তাহলে তাঁদের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য কাপল থেরাপির সাহায্য নিতে পারেন। তুমি তোমার মানসিক শক্তি বাড়াতে তাঁদের কলহের সময় ভাইবোনদের নিয়ে পাশের ঘরে চলে যাও, গান শোনো বা বই পড়ো; বড় বড় করে শ্বাসের ব্যায়াম করতে পারো (৪ সেকেন্ড শ্বাস নাও, ৪ সেকেন্ড শ্বাস ধরে রাখো, ৪ সেকেন্ড ধরে শ্বাস ছাড়ো)। ভাইবোনদের বলো এবং নিজেকেও বলো যে এটি তোমাদের দোষ নয়, বড়দের বিষয়; নিশ্চয়ই তাঁরা সমাধান করে ফেলবেন। একটি শান্ত ও আন্তরিক পারিবারিক সময় বেছে নিয়ে মা বা বাবা কিংবা দুজনের সঙ্গেই ধীরে ধীরে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে পারো, তাঁদের কলহ যে তোমাদের মনের ওপর তীব্র চাপ তৈরি করছে, সেটা বুঝিয়ে বলো। এ ক্ষেত্রে ওনারা চাইলেও তুমি নিরপেক্ষ থেকে কেবল নিজের বিষয়টি বলো। ওনাদের বুঝিয়ে বলতে পারো যে এসবের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মনোসামাজিক সহায়তা রয়েছে। ওনারা যেন মানসিক স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তুমি অবশ্যই নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যাবে এবং ভাইবোনদেরও পড়তে উৎসাহিত করবে।

প্রিয় মনোবন্ধু,
আমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। আমরা দুই বোন। আমার বড় আপু আছে। আমার বোন আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত ভালো। সে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। ২০২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আপু। ও প্রথমে ঢাবি অধিভুক্ত সাত কলেজের তিতুমীর কলেজে সুযোগ পায়, সেখানে ভর্তি হয়। কিছুদিন পর আপু গুচ্ছভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরে অন্যান্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোথাও সুযোগ পায়নি। ২০২৩ সালে আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য মেসেজ পায় আপু। তবে ও দ্বিতীয়বার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে আর যশোরে ভর্তি হতে যায়নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর কোথাও সুযোগ পায়নি আপু। এটা নিয়ে আমার আর আপুর মধ্যে প্রায়ই কথা-কাটাকাটি হয়। কারণ, আমার আপুর সব বান্ধবীই ভালো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেলে পড়ে। তাদের ভাইবোনদের সঙ্গে আবার আমি পড়ি। কিন্তু তাদের সামনে গেলে আমার নিজেকে ছোট মনে হয়। কারণ, সবাই তাদের কাছ থেকে তাদের বড় বোনের ভর্তি পরীক্ষার গল্প শোনে। আমার খুব কষ্ট হয়। আমি জানি, আপু আমার কথায় কষ্ট পায়। কিন্তু আমি নিজেকে সামলাতে পারি না।

আমি রাতে একা একা কান্না করি। আমার শুধু মনে হয়, যদি আপু যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো। ঘটনাটা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। আমি এখন কী করব? আমি খুবই হতাশাগ্রস্ত। আমার শুধু মনে হয়, আপু যদি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত। এখন আমার করণীয় কী?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

মনোবন্ধু : বাহ্। তুমি তোমার বড় বোনকে নিয়ে চিন্তা করছ, এটি অসাধারণ। কিন্তু মনে রাখবে, প্রতিষ্ঠানের ভালো-মন্দের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নিজের আত্মবিশ্বাস আর লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধৈর্য ধারণ করা। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই ভালো বা খারাপ নয়। তাই যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোটাই জরুরি। আবার তোমার বড় বোনের মনের অবস্থাটাও বোঝার চেষ্টা করবে। হয়তো তিনি নিজেই খানিকটা হতাশ অবস্থায় আছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করলে বা অন্যদের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর মন আরও বেশি খারাপ হতে পারে। তাই তাঁকে সাহস দেওয়া আর তাঁর পাশে থাকাটা তোমার জন্য বেশি জরুরি। তোমার বোনের বর্তমান অবস্থা কোনো ব্যর্থতা নয়। হয়তো কোনো ভিন্ন পথের সূচনা। তোমার আপুর সঙ্গে আন্তরিক আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখো, তাঁকে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে উৎসাহিত করো। একদিন দেখবে তোমার আপু নিজেই বলছেন, আমার ছোট বোনই আমার সব সফলতার প্রেরণা। সেই দিনের অপেক্ষায় থাকো।

কারও সঙ্গে আপুর তুলনা করবে না। নিজের পড়ালেখাও ঠিকমতো চালিয়ে যাও আর নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিকমতো সাজাও। তোমার ও তোমার আপুর জন্য শুভকামনা।

প্রিয় মনোবন্ধু,

আমি একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সম্প্রতি আমি কিছু মানসিক সমস্যায় ভুগছি। প্রথমত, আমি একই কাজ একবার করার পর আরও কয়েকবার করছি; কারণ, আমার মনে হচ্ছে যে কাজটা ভুল হয়েছিল। যেমন একবার দরজা বন্ধ করার পরও বারবার দেখা কিংবা ওজুর সময় একই হাত চার-পাঁচবার ধোয়া। দ্বিতীয়ত, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে সবাই আমাকে উপেক্ষা করছে। আমার কোনো বন্ধুবান্ধব মেসেজের উত্তর না দিলে বা দীর্ঘদিন নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা না বললে আমি ভাবি যে তারা আমাকে উপেক্ষা করছে, আমার সম্পর্কে তারা খারাপ কিছু হয়তো ভেবে বসেছে। ফলে আমি নিজেকে নিয়ে অনেক বেশি হীনম্মন্যতায় ভুগছি। কেন এ রকম হচ্ছে? আর সমাধানই-বা কী? জানালে বিশেষ উপকৃত হতাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

মনোবন্ধু : তোমার সমস্যাগুলো পড়ে মনে হচ্ছে, এগুলো অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডারের (ওসিডি) লক্ষণ। সঙ্গে খানিকটা সোশ্যাল এংজাইটিও আছে। কিন্তু সরাসরি কথা না বলে শুধু চিঠি পড়ে সমস্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তুমি চাইলে তোমার কাছাকাছি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলতে পারো।

তবে তার আগে তুমি '৫ সেকেন্ড রুল' (কোনো কিছু যাচাই করতে ইচ্ছা করলে ৫ সেকেন্ড থামো। নিজেকে বলো : 'ব্রেন ভুল সিগন্যাল দিচ্ছে, যাচাই করার দরকার নেই'); 'এক্সপোজার থেরাপি' (দরজার লক যাচাই না করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। দেখবে কিছুই হয়নি) এবং অজুর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা (যেমন তিনবার) মেনে চলো। এরপর নিজেকে বলো, 'সব ঠিক আছে, আমি পরিষ্কার হয়েছি।' আর সোশ্যাল এংজাইটির জন্য তুমি উদ্যোগ নিয়ে অন্যদের সঙ্গে কথা বলো, প্রয়োজনে বাড়িতে একা একা আয়নার সামনে অনুশীলন করো। খুব অস্থির লাগলে শ্বাসের ব্যায়াম করতে পারো (৪ সেকেন্ড শ্বাস নাও, ৪ সেকেন্ড শ্বাস ধরে রাখো, ৪ সেকেন্ড ধরে শ্বাস ছাড়ো)।

প্রিয় মনোবন্ধু,

আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছ? আশা করি ভালো। তবে আমি ভালো নেই। কিআতে অনেকের লেখা দেখে তোমাকে আমিও লিখলাম। আমার মা-বাবা আমাকে একদমই মুঠোফোন ধরতে দেন না। সারা দিন পড়ালেখার জন্য চাপ দেন। আমার বন্ধুরা সবাই মুঠোফোন চালায়। আমার মা-বাবা ইদানীং আমার ওপর অযথা সন্দেহ করছেন। যা যা করি, সবকিছুতেই দোষ ধরছেন। এখন আমার রাতে ঘুম হয় না। আমার মনে হয় ইনসমোনিয়া হয়ে গেছে। আর এসব বিষয় আমি মা-বাবাকে জানাতে চাই না। এখন আমি কী করতে পারি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

মনোবন্ধু : মনে রাখবে, মা-বাবা যা করছেন, তাঁরা হয়তো ভালো চেয়েই করছেন। কিন্তু সেটি সব সময় সঠিক প্রক্রিয়া নয় এবং তুমি মনে কষ্ট পাচ্ছ। তুমি মুঠোফোনে আসক্ত হয়ে পড়তে পারো, এই ভয়ে ওনারা এই আচরণ করছেন। ওনাদের ভয়টা বাস্তব, কিন্তু পদ্ধতিটি সঠিক নয়। এ জন্য তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে তোমাকে; শান্ত ও আন্তরিক পারিবারিক সময়ে তাঁদের বলো যে তুমি এ বিষয়ে মানসিক চাপ অনুভব করছ। আর তাঁদের আমার এই উত্তর দেখিয়ে বলবে, মুঠোফোন ব্যবহার করা তোমার বয়সে জরুরি, নইলে তুমি প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকবে। তবে তোমার বয়সে মুঠোফোনের ব্যবহার হতে হবে নিয়ন্ত্রিত। অবশ্যই মা-বাবার অনুমতি নিয়ে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তুমি মুঠোফোন ব্যবহার করবে। এর বেশি নয়। আর তোমার ঘুমের সমস্যার জন্য তুমি ঘুমের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলো, যাকে বলে 'স্লিপ হাইজিন'। রাতে জেগে থাকা আর দিনে ঘুমানো পরিহার করো, চেষ্টা করো প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে আর নির্দিষ্ট সময়ে জাগতে; এমনকি ছুটির দিনেও; দিনের বেলা 'ভাতঘুম' (ন্যাপ) না নিতে পারলে ভালো, তবে যদি নিতেই হয়, তবে ৩০ মিনিটের বেশি নয়; দিনের বেলা বিছানা বা সোফায় গড়ানো চলবে না, বিছানায় শুয়ে পত্রিকা বা বই পড়া, টিভি দেখা বা খাওয়ার অভ্যাস যেন গড়ে না ওঠে। বিছানা কেবল ঘুমের জন্য ব্যবহার করবে; দিনের বেলায় পর্যাপ্ত খেলাধুলা বা ব্যায়াম করবে, তবে রাতে ঘুমের আগে ব্যায়াম না করাই ভালো; ঘুমানোর অন্তত দুই ঘণ্টা আগে থেকে মুঠোফোন, টিভি, কম্পিউটার বা ল্যাপটপের ব্যবহার বন্ধ রাখবে।



উত্তর দিয়েছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

ডা. আহমেদ হেলাল

অধ্যাপক, চাইল্ড অ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি

এই বিভাগে তোমরা তোমাদের মানসিক নানা সমস্যা, যা তোমার শিক্ষক, মা-বাবা বা অন্য কাউকে বলতে পারছ না, তা আমাদের লিখে পাঠাও। পাঠানোর ঠিকানা—**মনোবন্ধু, কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা**। ইমেইল করো editor@kishoralo.com। সাবজেক্টে লিখবে 'মনোবন্ধু'।

প্রিয় বন্ধুরা,

তোমরা কি জানো, পৃথিবীর প্রায় সব সফল মানুষদের একটা অভ্যাস এক? তারা নিয়মিত বই পড়ে। বই শুধু গল্প বলে না, বই শেখায় কীভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়, সাহসী হতে হয় আর নিজের ভেতরের শক্তিকে চিনতে হয়। কিশোর বয়সেই যদি বইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারো, তাহলে সেটাই হবে তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ।

কেন বই পড়া তোমার জীবনের সেরা অভ্যাস

ভাবো তো, প্রতিদিন যদি তোমার হাতে একটা নতুন দুনিয়ার দরজা খুলে যেত! বই হলো সেই দরজা– যা তোমাকে ঘরে বসেই নিয়ে যেতে পারে মহাকাশে, প্রাচীন মিশরে বা ভবিষ্যতের কোনো রোবট শহরে।

বই পড়া মানেই শুধু পড়াশোনার জন্য নয়। এটা মজা করারও একটা দারুণ উপায়। যেভাবে গেমস বা সিনেমা আমাদের মন ভরায়, বইও পারে ঠিক তেমনভাবে মনের ভেতর ছবি আঁকতে।

গল্পের বই আমাদের কল্পনাশক্তিকে অনেক শক্তিশালী করে। তুমি যখন কোনো চরিত্রের হাসি-কান্না পড়ো, তখন মনে হয় যেন তুমি নিজেই তার জায়গায়। এভাবে আমরা অন্যকে বুঝতে শিখি।

বই পড়া মানে মস্তিষ্কের ব্যায়াম। যেমন শরীর ফিট রাখতে খেলাধুলা করি, তেমনি মগজ ফিট রাখতে পড়া খুব জরুরি। নিয়মিত পড়লে মনোযোগ বাড়ে, স্মৃতিশক্তি ভালো হয়।

তুমি যদি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হও, তাহলে বই তোমার সেরা সঙ্গী। তিন গোয়েন্দা, ফেলুদা, কিংবা হ্যারি পটার– সবাই তোমাকে দেবে ভিন্ন ধরনের রোমাঞ্চ।

বই পড়া আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ করে। নতুন নতুন শব্দ শিখি, কীভাবে সুন্দরভাবে লিখতে বা বলতে হয় সেটাও শিখি। স্কুলের রচনা কিংবা বিতর্কে বইপড়া দারুণ কাজে লাগে।

নন-ফিকশন বই আমাদের জানার ভান্ডার খুলে দেয়। মহাকাশ, প্রাণীজগৎ, বিজ্ঞান– সবই কিন্তু বইয়ের পাতায় লুকানো। ইন্টারনেট থাকলেও বইয়ের তথ্য মনে গেঁথে যায় সহজে।

বই আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। কারণ যখন আমরা নতুন কিছু জানি, তখন অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভয় কমে যায়। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় তুমি হয়ে উঠতে পারো সবার "গাইড"।

একটা বই কখনো কখনো আমাদের জীবনই বদলে দিতে পারে। যেমন মালালা পড়াশোনার বইকে আঁকড়ে ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছে। অনেকেই প্রিয় বই থেকে পেয়েছে নিজের স্বপ্ন বেছে নেওয়ার সাহস।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো– বই পড়তে টাকা-পয়সা বা বিশেষ কোনো গ্যাজেট লাগে না। একটা বই-ই তোমাকে শত সিনেমার মজা দিতে পারে, তাও একদম ঘরে বসেই।

রকমারির মতো প্ল্যাটফর্মে এখন বই পাওয়া আরও সহজ। তুমি চাইলে যে কোনো সময় অনলাইনে অর্ডার করে নিতে পারো তোমার প্রিয় বই। কোনো ঝামেলা ছাড়াই বই চলে আসবে তোমার হাতে।
তাহলে দেরি কেন? প্রতিদিন অন্তত ২০ মিনিট বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলো। দেখবে ধীরে ধীরে তোমার চিন্তা, কথা, এমনকি স্বপ্নও হয়ে উঠছে আরও বড়, আরও রঙিন।

প্রতি মাসেই রকমারিতে হাজারো শিশু-কিশোর বই বিক্রি হয়, কিন্তু কিছু বই পাঠকদের মন জয় করে নেয় বিশেষভাবে। সেই বইগুলোই চলে আসে বেস্ট সেলার তালিকায়।

দেখে নাও রকমারির গতমাসের বেস্ট সেলার শিশুকিশোর বইয়ের তালিকা

বুক আইডি	বই- লেখক	মুদ্রিত মূল্য
৪৪৯৪৫২	**Chotoder English Therapy/ Saiful Islam**	৫৯৯
৪৬৯৩৮	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১/১**- রকিব হাসান	১৬২
১১৯৩৪৯	**ইসলামী গল্প সিরিজ-১/** মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
৪৮৬৪২৮	**কিশোর আলো (আগস্ট – ২০২৫)/** কিশোর আলো	৫০
১৩৩৬	**শূন্য/** হুমায়ুন আহমেদ	১৮০
১১৫৬৪৫	**গল্প শুনি হাদিস শিখি/** মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক	১৬০
১১৯৩৫০	**ইসলামী গল্প সিরিজ-২/** মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
১৩৭৭৯	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১/২**- রকিব হাসান	১৪১
১১৫৬৪৬	**এসো আল কুরআনের গল্প শুনি**- মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক	৭০
৪৭৮৬৬৪	**কিশোর আলো (জুলাই – ২০২৫)**- কিশোর আলো	৫০
২১৫৮৪৭	**চাঁদের পাহাড়**- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০
৯৫৩	**দ্বিতীয় মানব**- হুমায়ুন আহমেদ	২০০
২৪৪৬৫৬	**ছোটদের আদব সিরিজ**- হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০

বুক আইডি	বই- লেখক	মুদ্রিত মূল্য
৫৭৮৭৫	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ২/২**- রকিব হাসান	১০৯
২৪৪৬৫৫	**ছোটদের আখলাক সিরিজ**/ হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০
২৮২৬৫৩	**প্যারাহীন**/ অন্তিক মাহমুদ	৩৪০
৪৭৬৮৭	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ২/১**- রকিব হাসান	১৩৭
৩৪৪৯৫৮	**Kids Spoken English Nazrul Islam Sir**	৪০০
৩৪৬৬৮৯	**চাঁদের পাহাড়**/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০
৫৭৮৪৭	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৩/১**- রকিব হাসান	১৫৮
২০৩০০৭	**চাঁদের পাহাড়**/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫০
১৯৫৭৫৭	**চল**/ অন্তিক মাহমুদ	৩২০
৩৫৮৬৬৭	**ছোটদের নবী রাসুলের গল্প**/ মাওলানা মুনীরুল ইসলাম	১২০
৩৯০৮১১	**Kids Vocabulary/ Nazrul Islam Sir**	৩২০
১১৯৩৫১	**ইসলামী গল্প সিরিজ-৩**/ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
৩৮৭৯০৭	**ভূতের স্কুল**/ সাব্বির আহমেদ সুবীর	১০০
১৩০৬	**বোতল ভূত**/ হুমায়ুন আহমেদ	১৫০
৪৭১৭৬৮	**কিশোর আলো (মে - ২০২৫)**- কিশোর আলো	৫০
৪৩৯০০৫	**মিসমিদের কবচ**/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২০
৩৭০৭৭০	**Chotoder Vocabulary/ Umme Maisun**	২৬০
১১৯৩৫২	**ইসলামী গল্প সিরিজ-৪**/ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
১৩১৯	**ছোটদের সেরা গল্প**/ হুমায়ুন আহমেদ	২৫০
৪৫০৬৫১	**চাঁদের পাহাড়**/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০
৪৭৯৮৬৫	**নোমান ১ আবারো**/ অন্তিক মাহমুদ	২৯৯
৫৭৭১২	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৩/২**- রকিব হাসান	১১৬
১৯৪৭২৩	**ছোটদের ঈমান সিরিজ**/ হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০
৪৩৯০০৭	**মরণের ডঙ্কা বাজে**/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২০
৪৪৬২২২	**ভুল**/ অন্তিক মাহমুদ	৮০০
২০৬৬৭৩	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৪/১**- রকিব হাসান	১০৯
২৬৯১৯৬	**Jhilmil Gyanbox (16pcs card book)/ Jhilmil**	১২৮০
৩৭৬০৩২	**ছোটদের নবি-রাসুল সিরিজ খন্ড : ৬**/ হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০
৪৫৩৬৩৯	**দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি**/ আদনান মুকিত	৪২৫
৪৭৫১৩৯	**ষোলো : ৯ম সংখ্যা**/ ষোলো টীম	৫০
৬৯৭৬৫	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১**/ রকিব হাসান	১২০
২২১৯১৬	**English Shikhbo Bangla Diye (Book 1-3)/ Saifur Rahman Khan**	৩৬০
১৭৭০৫৩	**স্টুডেন্ট হ্যাকস**/ আয়মান সাদিক	৩৪০
৭১৭৩৬	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৭**/ রকিব হাসান	১২৩
৪১০৬২৭	**হিমালয়ের ভয়ঙ্কর**/ হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৫০
১৫৪১৪১	**জলাভূমির আতঙ্ক**/ আলী ইমাম	৭০
৭১৭৩৭	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৮**/ রকিব হাসান	১০৪
৩৪৬৩৪৬	**মিসমিদের কবচ**/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫০
২১৬১২০	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৯**/ রকিব হাসান	১২২
১৩০৫	**পুতুল**/ হুমায়ুন আহমেদ	১৫০
৩৯৮৫৮	**সাইমুম সিরিজ ১ : অপারেশন তেলআবিব ১**/ আবুল আসাদ	৭০
১১৯৩৫৩	**ইসলামী গল্প সিরিজ-৫**/ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
২৯৯৯৯৮	**এসো নবিদের গল্প পড়ি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)**/ ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান	১১০
১৫৮৬৯৬	**অঙ্ক ভাইয়া**/ চমক হাসান	৪০০
১১০২৩৯	**জুনিয়র: বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড**/ মোস্তফা কামাল বিপব	৪৪০
৪৭৫৯৪৫	**কিশোর আলো (জুন - ২০২৫)**/ কিশোর আলো	৫০
৩৯৭৯০	**সাইমুম সিরিজ ২ : অপারেশন তেলআবিব ২**/ আবুল আসাদ	৭০
৪৮৮৫৮	**আদর্শ লিপি ও সরল বর্ণ পরিচয়**/ ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী	৪০
৭১৭৩৫	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৬**/ রকিব হাসান	১০৯
১৫২৩০১	**শিশু সীরাত সিরিজ ১ থেকে ১০ খন্ড**/ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ	৪০০
৩৫৯৫৪২	**ফিজিক্স অলিম্পিয়াড সমগ্র ক্যাটাগরি গ**/ তৌফিকুন নূর ফরিদ	৬০০
৪৮৫৭৬২	**কিশোরকণ্ঠ আগস্ট ২০২৫**/ কিশোরকণ্ঠ	৪০
১৫৬৯১০	**নেভার স্টপ লার্নিং**/ আয়মান সাদিক	৩০০
১৫৪৩১৯	**শেখ সাদীর ১৩২টি নির্বাচিত শিক্ষণীয় মজার ঘটনা**/ মুফতী আব্দুল আলীম	২৯০
৩৫২৬৬৩	**যকের ধন**/ হেমেন্দ্রকুমার রায়	২৫০
৩৩৬৮৯০	**প্যারাহীন ৩**/ অন্তিক মাহমুদ	২৮৫
৩৪৬৩৩৪	**Funny English Word Book/ Md. Morshed Alam (Sohag)**	১৪৫
৩৯৬৯১৮	**মহানবি (স) এর অলৌকিক ঘটনাবলী**/ ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান	১১০
২০৬৪৭৫	**বাল্যশিক্ষা**/ রামসুন্দর বসাক	৪০
৩৭১৩০৯	**ইংলিশ শিখবো বাংলা অর্থ বুঝে**/ সাইফুর রহমান খান	১২০
৭১৭৩৪	**তিন গোয়েন্দা ভলিউম -৫**/ রকিব হাসান	১২৩

রকমারিতে থাকা শিশুকিশোর ক্যাটাগরির বইগুলো দেখতে

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বই সংগ্রহ করতে স্ক্যান কর

[KIAROK25] প্রোমোকোড ব্যবহার করে বই অর্ডারে বুঝে নাও ৫% এক্সট্রা ছাড়!

রকমারি.com

পণ্য হাতে পেয়ে মূল্য পরিশোধ করুন

যেকোন সমস্যায় হ্যাপি রিটার্ন সুবিধা

যা কিছু দরকারি সাথে আছে রকমারি

রহস্যের দুনিয়ায় কিংবদন্তি দানবের খোঁজে

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার



মাঝেমধ্যে মনে হয়, করার মতো এত কিছু আছে যে এই ছোট্ট জীবনটা তার জন্য পর্যাপ্ত নয়। অবশ্য আমি যা যা করতে আগ্রহী, তা অভিভাবকদের চোখে এককথায় অর্থহীন। এই যেমন ধরো, ভিডিও গেম খেলা, অ্যানিমে দেখা, সিনেমা দেখা। একমাত্র বই পড়ার অভ্যাস বাদে বাকিগুলোর কোনোটাই সমাজ সেভাবে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। তাও কমিকস-মাঙ্গা পড়তে দেখলে ভুরু বাঁকা হয়ে যায়! সমাজ যা খুশি করুক, আমি তো আর থেমে নেই। নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়ে প্রতিটা অভ্যাসে কিছু কিছু বাতাস দিয়ে চলেছি নিত্যই। সমস্যা হচ্ছে, কোনোটাতেই ছাড় দিতে ইচ্ছা করে না। আর সব কটি চর্চা করার মতো যথেষ্ট সময় নেই।

মাঝেমধ্যে এমন হয় যে দুটো ভালো লাগার অভ্যাস একসঙ্গে উপভোগের সুযোগ চলে আসে। এই যেমন ধরো, ইদানীং একটা বইয়ের সিরিজ পড়ে গেম খেলার আনন্দ পাচ্ছি। লিট-আরপিজি (LitRPG) ধারার এই সিরিজটিতে মূলত ভিডিও গেমের ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে গল্প। ঠিক তেমনি মজা পেয়েছি *বোফুরি* (*BOFURI*) অ্যানিমেটি দেখে, যা নিয়ে আগেও একবার তোমাদের বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করেছি। আজও তেমনই একটি অ্যানিমের কথা তোমাদের জানাব, যাতে বাস্তব জীবন ও গেমের জীবনকে পাশাপাশি রেখে এগিয়েছে ঘটনাক্রম। আর তোমরা অ্যানিমেটি দেখে গেম খেলার মতোই আনন্দ পাবে।

বলছিলাম *শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার* অ্যানিমেটির কথা। কাতারিনার লেখা এই গল্পের সন্ধান আমি প্রথমে পেয়েছিলাম এক ইউটিউব ভিডিও থেকে। এ ছাড়া সে সময় শহরের একটা দোকানে নিয়মিত মাঙ্গা খুঁজতে যেতাম। প্রচ্ছদে পাখির মাথাওয়ালা এক চরিত্রের ছবি আকর্ষণও করেছিল বেশ। কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে আর সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি। এর কিছুদিন পরই দেখলাম অ্যানিমে আসছে, ফলে বেশ আগ্রহ নিয়েই দেখতে বসলাম।

গল্পের কাহিনি অনেকটা এমন—রাকুরোও হিজুতোমে বেশ ব্যতিক্রম একটা ছেলে। সে গেম খেলতে ভীষণ পছন্দ করে। তবে ভালো ভালো নামীদামি গেমের পরিবর্তে প্রচুর ত্রুটিপূর্ণ, কঠিন ঝামেলাপূর্ণ, খেলোয়াড়ের অভাবে প্রায় বাতিলের খাতায় চলে যাওয়া গেমগুলো খুঁজে খুঁজে খেলাই তার অভ্যাস! আর কাজটা সে ভীষণ আনন্দ ও গর্বের সঙ্গেই করে থাকে। একটা গেম খেলা শেষ হলে দোকানে চলে যায় নতুন কোনো বিচ্ছিরি গেমের সন্ধানে। ওই একই দোকানে আরও একটি মেয়ে মাঝেমধ্যেই যায়। তবে গেম খেলার চেয়ে রাকুরোওর প্রতিই তার আগ্রহ বেশি। মেয়েটির নাম রেই সাইগা। কিঞ্চিৎ লাজুক স্বভাবের রেই তার ভালো লাগার কথা রাকুরোওকে বলে উঠতে পারে না। যদিও তারা একই স্কুলে পড়ে, কিন্তু রাকুরোও তাকে ঠিকমতো চেনেও না।

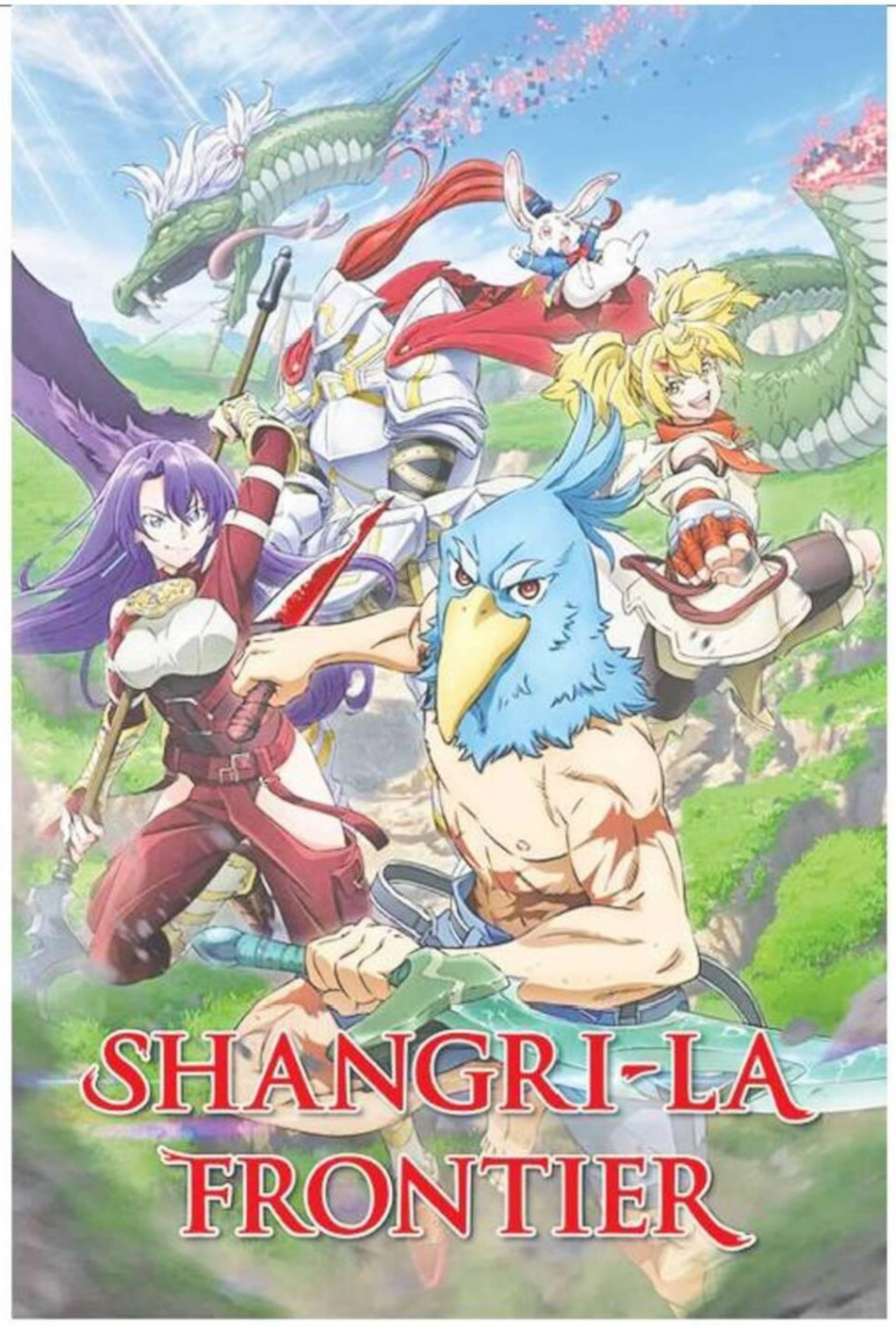
এমনই ঘটনা চলছিল। একদিন গেমের দোকানদার



রাকুরোওকে গছিয়ে দিল বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় গেম—শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার। আজেবাজে গেম খেলে অভ্যস্ত ছেলেটি খানিক কৌতূহলেই শুরু করল খেলা। গেমটি মূলত ভিআর বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গেম। এ গেমগুলোর ক্ষেত্রে চোখে অ্যাপল-ভিশনের মতো একধরনের গ্যাজেট সেঁটে নিলে খেলোয়াড়দের চেতনা সোজা পৌঁছে যায় গেমের দুনিয়ায়। গেমটি গুছিয়ে বানানো হলে সবকিছু নিখুঁতভাবে অনুভব করতে পারে খেলোয়াড়েরা। শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ারের নির্মাতা নামকরা এক গেম কোম্পানি, এ খেলায় যুক্ত হয়েছে প্রায় ৩০ মিলিয়ন খেলোয়াড়, ফলে গেমটির ভেতরে খুঁটিনাটি যে ভয়ানক নিখুঁত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাকুরোও বরাবরের মতোই—সানরাকু—ছদ্মনাম ব্যবহার করে যোগ দেয় খেলায়। নিজের চরিত্রটিকে সে ভাগ্যের কোটায় বেশি পয়েন্ট দিয়ে তৈরি করে।

গেম শুরু হতেই সানরাকু বুঝতে পারে, তার এযাবৎকালে খেলা গেমগুলোর তুলনায় এই গেম ভীষণ ভিন্ন। এতে বিরাট কোনো ত্রুটি প্রায় নেই বললেই চলে। সবকিছুই বলতে গেলে সঠিক আঙ্গিকে আছে। যেমন দৌড়ঝাঁপ করা কিংবা গাছে ওঠা, লড়াই করা—সবই যেমন হওয়ার কথা, তেমনই হচ্ছে। তাই দেরি না করে নিজের লেভেল বাড়ানোর কাজে মন দেয় সে। লড়াই করে গবলিন, ভোরপাল খরগোশের মতো প্রাণীদের সঙ্গে। ৫০টা ভোরপাল খরগোশ বধ করে সে হাসিল করে দুটি কার্যকর ছুরি।

সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন সে পড়ে গেল শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার গেমের অন্যতম কিংবদন্তি দানব—লিকাগন দ্য নাইটস্লেয়ারের খপ্পরে। শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার গেমে এমন দানব রয়েছে মোট সাতটি। যার মধ্যে কেবল চারটির নাম জানতে পেরেছে খেলোয়াড়েরা। বাকিগুলোর নাম পর্যন্ত কেউ জানে না। আর এসব দানবের একটাকেও এখন পর্যন্ত কেউ পরাজিত করতে পারেনি। সানরাকু এসবের বিন্দুবিসর্গ জানত না সে সময়। তবে হাল ছাড়তে সে নারাজ। আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে সে হারানোর চেষ্টা করে লিকাগনকে। শত শত নিখুঁত আঘাত করে আর আক্রমণ এড়িয়ে চেষ্টা করে জয় হাসিল করার। কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়। শেষতক হার মানতে বাধ্য হয় সে। তখনকার মতো মারা পড়ে দানবটির হাতে। জেগে উঠে সানরাকু দেখতে পায়, দানবের অভিশাপ বসে গেছে ওর দেহে। যত দিন দানবটিকে সরাসরি হারাতে না পারবে, এ অভিশাপ কাটানো সম্ভব হবে না। সুতরাং গেমটা খেলে যাওয়ার আরও জোরালো কারণ হাতে পায় সে। হারাতেই হবে



শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার অ্যানিমেতে খোদ গেম নির্মাতারাও চলে এসেছেন চরিত্র হিসেবে। গেম কোম্পানির প্রোগ্রামার, ম্যানেজার—তাঁরা গেমকে আরও কঠিন আর উপভোগ্য করার জন্য প্রাণপাত করে দিচ্ছেন

এই কিংবদন্তি ভয়াল দানবকে। শুরু হয় আরও আরও লড়াই, অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য উদ্ধারের যাত্রা।

শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার অবশ্য একেবারে শুরুতে মাঙ্গা নয়, বরং লাইট নভেল হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল স্বপ্রকাশিত লেখকদের ওয়েবসাইট সোসেৎসুকা-নি-নারোতে। সেখান থেকেই ২০২০ সাল নাগাদ আঁকিয়ে রুউস্কে ফুজি বইটি ধারাবাহিকভাবে মাঙ্গা মাধ্যমে রূপান্তরের কাজটি শুরু করেন। মাঙ্গাটি কোদানশার সাপ্তাহিক কিশোর ম্যাগাজিনে প্রকাশ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে নিয়ম মেনেই ভলিউম আকারে বাজারে আসে এবং অ্যানিমে নির্মাণকাজ এগোয়। স্টুডিও সিটুসির (C2C) প্রোডাকশনে মোহনীয় এই অ্যানিমেটি বলতে পারো একটি রত্ন। চমৎকার সব লড়াই, আনকোরা সব দানব, স্পেশাল এফেক্ট, কাহিনির নিয়মিত চমক একে করে







তুলেছে সাধারণের থেকে ভিন্ন।

আরেকটা দিক, যা আমাকে সব সময় কাহিনির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে, তা হচ্ছে গল্পে আসা চরিত্রগুলো। এই গল্পে অনেক অনেক বিশেষ চরিত্র রয়েছে। আর এদের অধিকাংশই একমুখী নয়। এদের আছে বহুমাত্রিকতা। প্রত্যেকেই নিজের নিজের লক্ষ্য নিয়ে যোগ দিয়েছে *শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার*-এ। যেমন ধরো, সানরাকুর মূল উদ্দেশ্য আনন্দ লাভ। আবার রেই সাইগা যোগ দিয়েছে কেবল সানরাকুর সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য, তার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ খুঁজতে। তবে একই সঙ্গে রেই একজন দক্ষ গেমার, *শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার*-এর অন্যতম ক্ষমতাধর চরিত্র সে। আমানে তোয়া, চরিত্রটি বোধ হয় সবচেয়ে ঘোলাটে, সে কখন কী চায় বোঝা কঠিন। মাঝেমধ্যেই তোমাদের তাকে বাজে, আবার পরক্ষণেই ভালো বলে মনে হয়। আছে উওমি কেই, যে কিনা আরও অনেক উদ্ভট গেম খেলে খেলে সানরাকুর বন্ধু হয়ে গেছে। তাই বন্ধুর উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যোগ দেয় খেলায়। বন্ধুর থেকে পিছিয়ে পড়তে সে বিন্দুমাত্র রাজি নয়।

গেমের খেলোয়াড়েরা তো বটেই, এমনকি এনপিসি (NPC = Non- Playable- Character), অর্থাৎ যারা গেমের ভেতরেই প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে নির্মিত, তারাও বেশ জরুরি। এ ক্ষেত্রে এমুল, বিলাক, ভাইজাশ, হাকামরি-নো-ওয়েদারমন, আরামিস, লিকাগন দ্য নাইটস্লেয়ার—এরা বিশেষ। মূলত এমুল আর সানরাকুর জুটি একই সঙ্গে কার্যকর ও আনন্দদায়ক। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, অ্যানিমেতে এমুল চরিত্রের কণ্ঠশিল্পী রিনা হিদাকা ও সানরাকু চরিত্রের কণ্ঠশিল্পী ইয়ুমা উচিদা, সিরিজটিতে কাজ শুরু করার পর এক পর্যায়ে ব্যক্তিজীবনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

এ তো গেল গেমের ভেতরে থাকা চরিত্ররা। *শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার* অ্যানিমেতে খোদ গেম নির্মাতারাও চলে এসেছেন চরিত্র হিসেবে। গেম কোম্পানির প্রোগ্রামার, ম্যানেজার—তাঁরা গেমকে আরও কঠিন আর উপভোগ্য করার জন্য প্রাণপাত করে দিচ্ছেন। খেলাটির প্রতি তাঁদের ভালোবাসার নমুনা তোমরা দেখতে পাবে তাঁদের কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে।

লেখক কাতারিনা নিজে মূলত একজন রোল-প্লেয়িং গেম ভক্ত। ফাইনাল ফ্যান্টাসি, মনস্টার হান্টার, ডার্ক সোলস, জেনোব্লেড ক্রনিক্যালস, এল্ডেন রিংয়ের মতো গেমগুলো তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। আর এ ধরনের লেখালেখির ক্ষেত্রে আগ্রহ বাড়িয়েছে প্রবাসে থাকাকালে পড়া লাইট নভেল—*দ্য ইরেগুলার অ্যাট হাইস্কুল*। মূলত এ গল্প ওয়েবসাইট সোসেৎসুকা-নি-নারোতে পড়েছিলেন তিনি। তোমরা যারা এল্ডেন রিং গেমটি খেলেছ, তারা হয়তো *শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার*-এ সানরাকু চরিত্রটিকে একেবারে বর্মহীন রাখার পেছনের অনুপ্রেরণাটা ধরতে পারবে। আমি গেমটি প্রায় দুই শ ঘণ্টা খেলেছি। ভয়ানক কঠিন এই গেমটির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নানা ধরনের চরিত্র নিয়ে একেবারে নিজের মতো করে আক্রমণ আর কৌশল সাজিয়ে গেমটি খেলা সম্ভব। ফলে একেবারে ঢাল-তলোয়ার ছাড়া খেলার যেমন স্বাধীনতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিরাট তলোয়ার নিয়ে খেলার উপায়, আবার চাইলে কেবল জাদু বা শুধু তিরন্দাজি করেও হারানো সম্ভব গেমটির ভয়ানক সব শত্রুকে। লেখক কাতারিনার একেবারে সীমিত অস্ত্র নিয়ে বর্মহীন থেকে কেবল আঘাত এড়ানোর দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে লড়াইয়ের কৌশলটি বেশি মনে ধরেছিল। আর সেখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে সানরাকুর চরিত্রটিকে নির্মাণ করা হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

অনেক কথাই বলা হলো, বাকি রয়ে গেল আরও অনেক কিছু। তোমরা সিরিজটি দেখা শুরু করলে বাকি কথাগুলোও দিব্যি জেনে যাবে। এখন পর্যন্ত দুটো সিজনে ৫০টির মতো পর্ব মুক্তি পেয়েছে এই ধারাবাহিকের। তৃতীয় সিজনের ঘোষণাও চলে এসেছে ইতিমধ্যে, আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তার জন্য।

দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল তোমাদের এই অ্যানিমেটির ব্যাপারে জানাব, সে কাজটি সম্পন্ন হলো অবশেষে। যদিও এই সিজনে প্রায় ১৮টি অ্যানিমে ধারাবাহিক দেখছি, সেগুলোর অধিকাংশ নিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ করছি না। তবে তোমরা জেনে খুশি হবে, *সাকামোতো ডেজ*, *কাইজু নম্বর এইট*, *দান-দা-দান*-এর মতো অ্যানিমেগুলোর দ্বিতীয় সিজন বর্তমানে চলছে এবং চমৎকারভাবে বিনোদিত করছে। নতুন সিজনের মধ্যে *তোউগেন আনকি*, *গাচিআকুতা*—এককথায় ফাটাফাটি হচ্ছে। এ ছাড়া টুকিটাকির মধ্যে ভালো লাগছে *দ্য ওয়াটার ম্যাজিশিয়ান*, *অনমিও কাইতেন*, *সিক্রেটস অব দ্য সাইলেন্ট উইচ*। এ ছাড়া আরেকটি অ্যানিমে বড় ভালো লাগছে, তবে নামটা এত বড় যে লিখতে ইচ্ছা করছে না। পরে কখনো সুযোগ পেলে ওটা নিয়ে তোমাদের বিস্তারিত জানানোর ইচ্ছা রইল। তোমরাও জানিয়ো *শাংঘ্রি-লা ফ্রন্টিয়ার* অ্যানিমেটি তোমাদের পছন্দ হলো কি না!

মনিপুর স্কুলে শিক্ষার্থীরা আয়োজন করেছে টেডএক্স ইয়ুথ



মনিপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা আয়োজন করেছে টেডএক্স ইয়ুথ অ্যাট মনিপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ। গত ১৬ আগস্ট ২০২৫ স্কুল অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। এই আয়োজনের থিম 'রেভল্যুশন বাই রেবেলিয়ন'।

একটি টেড টক দেখে মনিপুর স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী লাজিম মুস্তাহাব আদিব বন্ধুদের নিয়ে এই উদ্যোগের প্রাথমিক পরিকল্পনা শুরু করে। টেডএক্স ওয়েবসাইটের শর্ত অনুযায়ী আয়োজনের লাইসেন্স পেতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। স্কুলের একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ান। আয়োজনের অনুমোদন পেয়ে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।

এ অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট আহসান হাবিব, কনটেন্ট ক্রিয়েটর সাদমান সাদিক, জনপ্রিয় লেখক ও স্ক্রিপ্ট রাইটার নাজিম উদ দৌলা, স্টোরি হেড নামে পরিচিত ইমতিয়াজ অর্ণব। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিতার্কিক গাজী মাহাতাব, এভারেস্টজয়ী ইকরামুল শাকিল, মাহিমমেক্স নামে পরিচিত মাহিম আহমেদ, নাইম আশরাফ, উৎস বসু, বিজ্ঞানবক্তা আসিফ এবং দীপা খন্দকার। ইয়ুথ স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাজওয়ার মোস্তফা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ড্রিম ওয়েভারের সিইও জুবায়ের হোসেন শুভ।

মনিপুর স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী লাজিম মুস্তাহাব আদিব বলেছে, 'এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য তরুণদের অনুপ্রাণিত করা, তাদের মধ্যে নেতৃত্ব ও সৃজনশীলতা বিকাশের পরিবেশ তৈরি করা। বাংলা মিডিয়াম স্কুলে মানসম্মত টেডএক্স আয়োজন করতে পারা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।'

টেডএক্স ইয়ুথের পর্বটি সঞ্চালনা করেছে আবরার আল শাকি, ফারিহা তাসনিন মোমো, ফারহান তানভিন, ফাহমিদ ও নাভিদ আল হাসান। সহ-আয়োজক হিসেবে ছিল ফাওজিয়া তাবাসসুম ওহি এবং মাহবুবা শিকদার। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছে সাদিয়া ইসলাম রিমি ও আরাফ আরশাদ জিয়ান। আয়োজনটির ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো।

কিআ প্রতিবেদক

পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্র্যাকের ইকোনমিকস ক্লাবের আয়োজন



ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইকোনমিকস ক্লাব বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করেছে। যার শিরোনাম 'নিজ দেশে নেতৃত্বের বিকাশ : তৈরি পোশাকশিল্পে নতুন প্রজন্ম গঠন'। ২৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা ও তরুণ শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছেন। ৪০ বিলিয়ন ডলারের এই খাতকে কীভাবে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেন প্যানেলিস্টরা।

প্যানেলে উপস্থিত ছিলেন শেল্‌টেক্ গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তানভীর আহমেদ, সায়েম গ্রুপের ডিরেক্টর আবরার এইচ সায়েম, অ্যাসরোটেক্স গ্রুপের ডিরেক্টর আবরার এ খান এবং লিথি গ্রুপের ডিরেক্টর লিথি এম মহিউদ্দিন। সঞ্চালনা করেন ব্র্যাকের সিনিয়র লেকচারার সিফাত ইসলাম ইশতি।

প্যানেলে বক্তারা জোর দিয়ে বলেছেন, তরুণদের অংশগ্রহণ, উদ্ভাবন এবং নতুন নীতিগত সংস্কারের মাধ্যমে এই রূপান্তর করা সম্ভব। শেল্‌টেক্ গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তানভীর আহমেদ বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির সময়েও কর্মী ছাঁটাই না করায় পরে তাঁর প্রতিষ্ঠান ২৮০ শতাংশ মুনাফা অর্জন করেছে। তিনি আরও জানান, বিদেশি পেশাজীবীদের পেছনে প্রতিবছর প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়, যা কমাতে দেশীয় স্নাতকদের দক্ষতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি করা জরুরি।

অন্য বক্তারা শিক্ষার্থীদের সাপ্লাই চেইন, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, রপ্তানিকৌশল এবং ডিজিটাল টুলসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, এই শিল্পে কেবল সাধারণ চাকরি নয়; বরং অর্থনীতি ও প্রযুক্তি স্নাতকদের জন্য নেতৃত্ব দেওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে।

সেমিনারে দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়তে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়, বিদেশি নির্ভরতা কমাতে তারা যেন এই খাতকে নিজেদের নেতৃত্ব বিকাশের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে ভারত, চীন ও ভিয়েতনামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারবে বলে তাঁরা আশা করেন। আয়োজনটির ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো।

কিআ প্রতিবেদক

পিরিয়ডের দিনগুলোয় যা খেয়ে ভালো থাকবে

রাফিয়া আলম

পিরিয়ডের দিনগুলো একটু অন্য রকম। এ সময় মনমেজাজেও খানিকটা বদল আসতে পারে। তবে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, আরামদায়ক পোশাক, সঠিক খাবারদাবার, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও নিয়মমাফিক শরীরচর্চায় এ সময়টাও হয়ে ওঠে সহজ। দেহ ও মনের সুস্থতায় খাবারদাবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টাঙ্গাইলের কুমুদিনী সরকারি কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের প্রধান শম্পা শারমিন খান বলছিলেন, ‘এ দেশে এমন বহু কিশোরী আছে, রক্তক্ষরণের ফলে যাদের আয়রনের ঘাটতি হয়। আয়রনের ঘাটতি হলে যে কেউ অতিরিক্ত ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করতে পারে। মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরানোর মতো সমস্যাও দেখা দেয়। নখ হয়ে পড়ে ভঙ্গুর। রক্তক্ষরণের কারণে পানিশূন্যতায়ও ভোগে অনেকেই। অত্যধিক ক্লান্তি, মাথাব্যথা ও দুর্বলতার এটাও একটা কারণ। পানিশূন্যতায় ত্বক-চুলও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। আয়রনসমৃদ্ধ ও তরল খাবার এ সময়ের জন্য ভীষণ জরুরি। তা ছাড়া এ সময়ের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো সামলাতে উপকারে আসবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস।’

তবে একেবারে ডায়েট চার্ট তৈরি করে ফেলতে হবে, তেমনটাও কিন্তু নয়। রোজকার খাবারেই মিটবে প্রয়োজন। তবে জানা থাকতে হবে কোনটা বেশি প্রয়োজন, আর কোনটা একটু কম খাওয়া ভালো। বিস্তারিত জেনে নাও এই পুষ্টিবিদের কাছ থেকেই।

তরল খাবার

পিরিয়ডে রক্তক্ষরণ হয় বলে পানির চাহিদা বাড়ে। পানি ছাড়াও অন্যান্য তরল খেতে পারো। তবে পানীয়তে চিনি যোগ না করাই ভালো; করলেও খুব কম পরিমাণে। প্যাকেটজাত ও বোতলজাত পানীয়তে বাড়তি চিনি থাকে। এগুলো এড়িয়ে চলাই ভালো। চিনি খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ে খুব দ্রুত। আবার তা কমেও যায় অল্প সময়ের মধ্যেই। এভাবে চট করে গ্লুকোজ কমে বা বেড়ে যাওয়াটা স্বাস্থ্যকর নয়। হুট করে মনমেজাজ বিগড়ে যাওয়ার সঙ্গেও এর সম্পর্ক থাকতে পারে। অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় খাবারও বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিত নয় ঠিক এ কারণেই। ঘরে তৈরি ফলের রস ভালো। লেবুর শরবত, বেলের শরবত প্রভৃতি খেতে পারো। পিরিয়ডের দিনগুলোয় আদা-চা খেলে স্বস্তি পাবে। তবে অতিরিক্ত চা-কফি খেলে পানিশূন্যতা ও মাথাব্যথা হতে পারে। চা-কফি খেলে তা আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার অন্তত ঘণ্টা দুই আগে বা পরে খাওয়া উচিত, নইলে সেই আয়রন দেহে ঠিকভাবে শোষণ হবে না।

মাছ-মাংস-কলিজা-ডিম-দুধ

মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম ও দুধে আমিষ ছাড়াও পাবে আয়রন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান। দুধ খেতে ভালো না লাগলে দই বা টক দইও খেতে পারো। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়বে। এই বয়সের আয়রনের চাহিদা মেটাতে এসব প্রাণিজ উপাদান আবশ্যক।

ফলমূল, শাকসবজি ও ডাল

গাঢ় সবুজ শাকসবজি, খেজুর, পেয়ারা, নাশপাতি ও আপেলের মতো কিছু ফলমূল এবং ডালেও কিছুটা আয়রন পাবে। ডালে আমিষও পাবে। উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন খাবার বেশি পরিমাণে খাবে। এগুলো থেকেই ভিটামিন ও খনিজ উপাদান পাবে। তাতে সুস্থ ও সতেজ থাকবে তুমি। সংক্রমণের ঝুঁকিও কমবে। উদ্ভিজ্জ খাবারের আয়রন আমাদের দেহের কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন ভিটামিন সি। এই ভিটামিন সি পাবে বিভিন্ন টক ফল থেকে। তাই সবজি বা ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ার সময় লেবু নিতে পারো। মজার ব্যাপার হলো, লেবুর রসের চেয়ে বেশি ভিটামিন সি পাওয়া যায় এর খোসায়। তাই ভাতের সঙ্গে লেবুর খোসার খানিকটা অংশ চিবিয়ে নিলে আরও ভালো। তবে মনে রাখবে, তাপে ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়। তাই আচার বা চাটনি টক হলেও তাতে ভিটামিন সি পাবে না।

আরও যা

ঢেঁকিছাঁটা চাল, লাল আটা, ওট, কিনোয়া, যব অর্থাৎ গোটা শস্যের (হোল গ্রেইন) তৈরি খাবার খেতে পারো। এসব খাবার আমাদের রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা হুট করে বাড়ায় না, তাই দেহ ও মনের জন্য ভালো।

গোটা শস্য, বাদাম আর বীজে পাবে নানান খনিজ উপাদান।

ডার্ক চকলেট এই সময়ের জন্য ভালো।

তবে বাড়তি লবণ ও অতিরিক্ত মসলা দেওয়া খাবার খেলে অস্বস্তি বাড়তে পারে।

সুপার ড্রাই স্বাস্থ্য কুইজ

১. পিরিয়ডের সময় শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে যায় বলে কোন পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি হতে পারে?

ক. আয়রন খ. ক্যালসিয়াম

২. অতিরিক্ত চা বা কফি খেলে পিরিয়ডের সময় কোন সমস্যা হতে পারে?

ক. পানিশূন্যতা ও মাথাব্যথা খ. পেট ব্যথা ও বমি বমি ভাব

স্বাস্থ্য কুইজ ২ বিজয়ী

পরিমনি, অষ্টম শ্রেণি, অ্যাফেক রেসিডেনশিয়াল মডেল স্কুল, দিনাজপুর

লামিয়া ইসলাম, দশম শ্রেণি, খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুল, খুলনা

তাহিয়াতুল জান্নাতী, ষষ্ঠ শ্রেণি, শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর

ওপরের কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নাও পুরস্কার। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জনকে দেওয়া হবে পুরস্কার। উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : স্বাস্থ্য কুইজ ৩, কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১২১৫। অথবা ই-মেইল করো editor@kishoralo.com- এ। সাবজেক্টে লিখবে : স্বাস্থ্য কুইজ ৩। উত্তর পাঠানোর শেষ সময় ২০ সেপ্টেম্বর।

freedom™ Super Dry Sanitary Napkin

ACI

লিকেজ

কটন সফট টপশিট

৬ লেয়ারের অ্যান্টি-লিক চ্যানেল

র‍্যাশ

চওড়া প্যাড দিবে অধিক সুরক্ষা

অস্বস্তি

পিরিয়ডে থাকো সুপার ড্রাই



জানো তো?

সস্ মিক্সের আসল স্বাদে
অথেনটিক রামেন মানেই
চপস্টিক রামেন!

চপস্টিক
রামেন

সস্ মিক্স আর সিজনিংয়ের
অথেনটিক কম্বিনিশনে

1st EVER
AUTHENTIC
RAMEN
OF BANGLADESH

বিস্তারিত
জানতে
স্ক্যান
করুন



স্কয়ার
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ



এবার এশিয়া কাপে ভাগ্য ফিরবে কি

মৃণাল সাহা

বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে বারবার কোন শিরোপা এসে হানা দিয়েছে বলতে পারবে? কোনো সন্দেহ ছাড়াই উত্তরটা হবে এশিয়া কাপ। এশিয়া কাপ নিয়ে বাংলাদেশের আশা প্রতিবারই থাকে আকাশচুম্বী। যে টুর্নামেন্ট দিয়ে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব ক্রিকেটে পা দেওয়া, যে টুর্নামেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এত এত সুন্দর স্মৃতি, সেই টুর্নামেন্টই দিন শেষে কাঁদিয়েছে বাংলার মানুষকে বারবার। ২০২৫ সালে এসে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে কি?

আসন্ন বিশ্বকাপের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় এশিয়া কাপের ফরম্যাটও। ২০২৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে আয়োজন করতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসর। যে কারণে এবারের এশিয়া কাপও হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। তবে শুরুর আগেই বরাবরের মতো এক দফা ঝামেলা নিয়ে প্রস্তুত ছিল এশিয়া কাপ।

শিডিউল অনুযায়ী এশিয়া কাপ আয়োজনের কথা ছিল এই বছরের জুনে, ভেন্যু ছিল ভারত। কিন্তু এর আগেই বাড়তে থাকল রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধাবস্থা। ফলাফল? এশিয়া কাপে শুরুতে দল অনিশ্চিত, এরপর ভেন্যু। যত কিছুই হোক না কেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের কড়কড়ে টাকার লোভ ছাড়তে পারে না কেউই। তাই তো যতই ওপরে ওপরে লড়াই চলুক না কেন, ম্যাচ হতেই হবে। তাই তো টুর্নামেন্ট উড়ে গেল সংযুক্ত আরব আমিরাতে। বদলে যাওয়া সময়ে টুর্নামেন্ট চলবে ৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বরে।

এবারের এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে ৮ দল। এশিয়া কাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দলের অংশগ্রহণ হচ্ছে এবার। সরাসরি সুযোগ পেয়েছে টেস্ট খেলা পাঁচ দল, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কা। আর বাকি তিন দল এসেছে বাছাইপর্ব খেলে।





বাংলাদেশকে ভালো করতে হবে অধিনায়ক লিটন দাস ছন্দে থাকা প্রয়োজন

গত বছর এপ্রিলে ওমানে অনুষ্ঠিত হয় এশিয়া কাপের বাছাইপর্ব 'এসিসি প্রিমিয়ার কাপ'। সেখানে অংশ নিয়েছিল ১০ দল। প্রিমিয়ার কাপের ফাইনালিস্ট দুই দল ওমান আর সংযুক্ত আরব আমিরাতও যোগ দেয় এশিয়া কাপে। আর তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে নেপালকে ৪ উইকেটে হারিয়ে শেষ জায়গাটি করে নেয় হংকং। এবারই প্রথম এশিয়া কাপের মঞ্চে দেখা যাবে ওমানকে।

আট দলকে ভাগ করা হয়েছে দুটি গ্রুপে। প্রথমে রাউন্ড রবিন, এরপর দুই গ্রুপের শীর্ষ দুই দল, মোট চার দল আবারও মুখোমুখি হবে একে অপরের। অতঃপর সেখান থেকে শীর্ষ দুই দল যাবে ফাইনালে।

গ্রুপ এ	গ্রুপ বি
ভারত	বাংলাদেশ
পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা
ওমান	আফগানিস্তান
সংযুক্ত আরব আমিরাত	হংকং

এশিয়া কাপ নিয়ে তো অনেক জানা হলো, এবার আসা যাক নিজেদের দেশের কথায়। বরাবরের মতো বিশাল স্বপ্ন আর এক বুক আশা নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পা দেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। এবার কি টাইগারদের আশা পূরণ হবে? নাকি আগের মতোই ঘুরপাক খাবে হারের বৃত্তে?

শুরু করা যাক বাংলাদেশের ফিকশ্চার দিয়ে। বাংলাদেশের খেলা এমন তিন দলের বিপক্ষে যাদের সঙ্গে আনন্দের চেয়ে দুঃখের স্মৃতিই বেশি। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে।

বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ হংকংয়ের সঙ্গে। অনেক আগে থেকে যারা ক্রিকেট খেলা দেখো, তাদের নিশ্চয় মনে আছে হংকং ট্র্যাজেডির কথা। ঘরের মাটিতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে হংকং হারিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা বলছি। হংকংয়ের সঙ্গে এটাই ছিল এই ফরম্যাটে বাংলাদেশের একমাত্র দেখা, আর সেখানেই লেপটে আছে হারের স্মৃতি। যদিও তুলনামূলক খর্বশক্তির দল, কিন্তু পুরোনো স্মৃতি খুঁজলে দেখা যায়, একটা ক্ষত তো রয়ে গেছেই।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ 'চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী' শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ভারত-পাকিস্তান, ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মতো বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা যেন ক্রিকেট দুনিয়ার নতুন রিভালরি। যার পরিচিতি দুনিয়ার কাছে 'নাগিন ডার্বি' নামে। নাগিন নাচ থেকে শুরু হওয়া এই লড়াই বছরে বছরে ক্রমান্বয়ে শুধু বেড়েই চলেছে। ২০২৩ বিশ্বকাপে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের 'টাইম আউট'-কাণ্ড দুই দলের দ্বৈরথ বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। এর পর থেকে যেন দুই দলের সমর্থকেরাই অপেক্ষায় থাকেন, কখন মুখোমুখি হবেন আর দুই দেশের সমর্থকেরা মাতবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়!

আর বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ আফগানিস্তানের বিপক্ষে। টি-টোয়েন্টি জগতে আফগানদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। একের পর এক তারকা খেলোয়াড় যেভাবে বেরিয়ে আসছে আফগানিস্তান থেকে। ঠিক সেভাবেই টি-টোয়েন্টিতে এগিয়েছে তারা। গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলাই যেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আফগানদের বিপক্ষে ক্রিকেটের সবচেয়ে ছোট ফরম্যাটে বেগ পেতে হবে নতুন বাংলাদেশকে।

একনজরে এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল :
লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক)/(উইকেটরক্ষক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান (উইকেটরক্ষক), শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

স্ট্যান্ডবাই : সৌম্য সরকার, মেহেদী হাসান মিরাজ, তানভীর ইসলাম ও হাসান মাহমুদ।

এশিয়া কাপের জন্য ১৬ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি। সেখানে সবচেয়ে বড় চমক বোধ হয় উইকেটরক্ষক নুরুল হাসান সোহান। প্রায় তিন বছর পর ফিরেছেন টি-টোয়েন্টি দলে। তাঁর সঙ্গে ফিরেছেন সাইফ হাসানও। মূল স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ, যদিও দলের সঙ্গে যাবেন। সাইফ আর সোহান বহুদিন পর দলে ফিরলেও দলের দরজায় কড়া নাড়ছিলেন অনেক দিন ধরেই। টি-টোয়েন্টিতে রান পাচ্ছেন, বিপিএল-গ্লোবাল সুপার লিগে চমক দেখিয়েছেন। সোহানের অধিনায়কত্ব মনে ধরেছে অনেকের। এমনকি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে বেশ ভালো করেছেন দুজন। তাঁরা যেমন দলে যোগ দিয়েছেন, তেমনই দলে কম্বিনেশনও হচ্ছে চমৎকার।

ওপেনিংয়ে তানজিদ হাসান তামিম আর পারভেজ হোসেন ইমনের ওপেনিং জুটি ভালো করছে বেশ কিছুদিন ধরেই। প্রতি ম্যাচেই অন্তত একজন হাতে ধরে গড়ে তুলছেন ইনিংস। এমনকি ওপেনিং ছাড়ার পর ব্যাটে রান পাচ্ছেন অধিনায়ক লিটন দাসও। আর বল হাতে সদা প্রস্তুত মোস্তাফিজ, সাকিব, তাসকিন, শরীফুলরা। তাঁদের মধ্য থেকে কারা একাদশে জায়গা করে নেবেন, সে নিয়ে চিন্তায় পড়তে হবে কোচ ফিল সিমন্সের। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচ সঠিক সিদ্ধান্তই নেবেন বলে আশা সবার। নইলে তরুণ এই দলটাকে নিয়েও বাংলাদেশকে ফিরতে হবে ব্যর্থ মনোরথে।

রূপালী ব্যাংক

নিয়ে এলো আকর্ষণীয় ৩টি নতুন স্কিম



স্কিমের নাম	স্কিমের মেয়াদ	সুদ/মুনাফার হার	জমার পরিমাণ (টাঃ)	মাসিক মুনাফা/ মেয়াদপূর্তিতে পরিশোধ
রূপালী আস্থা রূপালী মান্থলি আর্নিং স্কিম	০৩ (তিন) বছর	১০.২৫% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক	প্রতি ১ লক্ষ এর মাসিক মুনাফা টাঃ ৮৫৪.০০
রূপালী শ্রদ্ধা রূপালী মান্থলি বেনিফিট ফর সিনিয়র সিটিজেন	০৩ (তিন) বছর	১০.৫০% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক তবে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ	প্রতি ১ লক্ষ এর মাসিক মুনাফা টাঃ ৮৭৫.০০
রূপালী ডাবল বেনিফিট স্কিম আরডিবিএস	৬ (ছয়) বছর ০৯ (নয়) মাস	১০.৮২% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক	প্রতি ১ লক্ষ এর বিপরীতে মেয়াদপূর্তিতে প্রদেয় টাঃ ২ লক্ষ

* বিধি মোতাবেক সরকার নির্ধারিত হার অনুযায়ী উৎসে কর এবং আবগারী শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

হিসাব খোলার জন্য রূপালী ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন

রূপালী ব্যাংক পিএলসি

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.com.bd

কিআ মিম কনটেস্ট ৭

আরও সেরা ১০

১

বান্ধবীর বাসায় যাওয়ার সময় লিফটে ওঠার পর যখন মনে পড়ে না সে কততলায় থাকে।

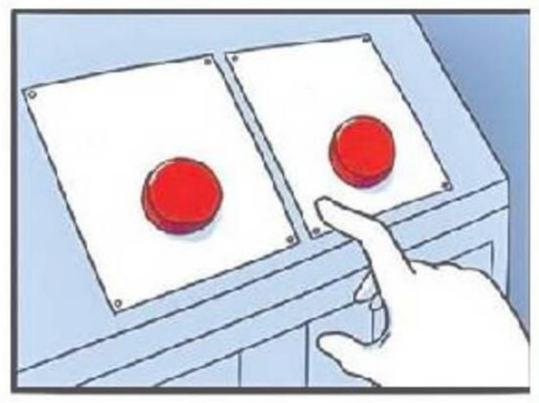
শায়মা বিনতে শহীদ
চতুর্থ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

২

বিটিএস ও ব্ল্যাকপিঙ্কের মধ্য থেকে যেকোনো একটি কনসার্টের টিকিট বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার অবস্থা —

তানহা তাছনিম খান
এসএসসি ২০২৫, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সেরা মিম



মাশফি নেহা
অষ্টম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

৩

বাংলা ২য় পরীক্ষায় যখন প্রশ্ন করে—
কমলা কী?
ক) রং খ) ফল
(আমার অবস্থা)

ফজলে আজিজ রিসালাত
দশম শ্রেণি, দারুননাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা

৪

দুইটা মিম রেডি করার পর কোনটা পাঠাব, বুঝতে না পারা আমি—

মুহাম্মদ মুস্তাবীন শরীফ
সপ্তম শ্রেণী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম

৫

'আমরা সবাই রাজা' বিভাগের জন্য লেখা নির্বাচনের সময় কিশোর আলোর অবস্থা :

মো. খাইরুল বাসার
অষ্টম শ্রেণি, মুকুল নিকেতন উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

৬

জন্মদিনে মা যখন বলে কোন গিফটটা নেবে, তখন আমি

আহমেদ ওয়াফি
পঞ্চম শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

৭

আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়ে রাত একটায় সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর যখন লাইট আর ফ্যানের সুইচ গুলিয়ে ফেলি, তখন আমি

সাফওয়ান আহমেদ
অষ্টম শ্রেণি, জয়নব নেসা মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়, গাজীপুর

৮

যখন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'তিন গোয়েন্দা, নাকি অয়ন-জিমি'

নুযহাত ইসলাম
একাদশ শ্রেণি, হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা

৯

পরীক্ষার সময় কিআ পড়ব, নাকি পাঠ্যবই পড়ব, ভাবতে থাকা আমি

তাহমিদ বিন নজরুল
শ্রেণি ষষ্ঠ, সেন্ট মেরী'স স্কুল, চট্টগ্রাম

১০

পরীক্ষায় MCQ—এর বৃত্ত ভরাট করার সময় আমি

মোহাম্মদ আকিল
সপ্তম শ্রেণি, দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলাম বারী সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

তোমাদের মিমগুলো দারুণ! প্রচুর মিম পেয়েছি আমরা। সেরা কয়েকটি মিম ছাপা হলো এ সংখ্যায়। মিম কনটেস্ট ছাড়া আরও মিম পাঠাতে পারো তোমরা।

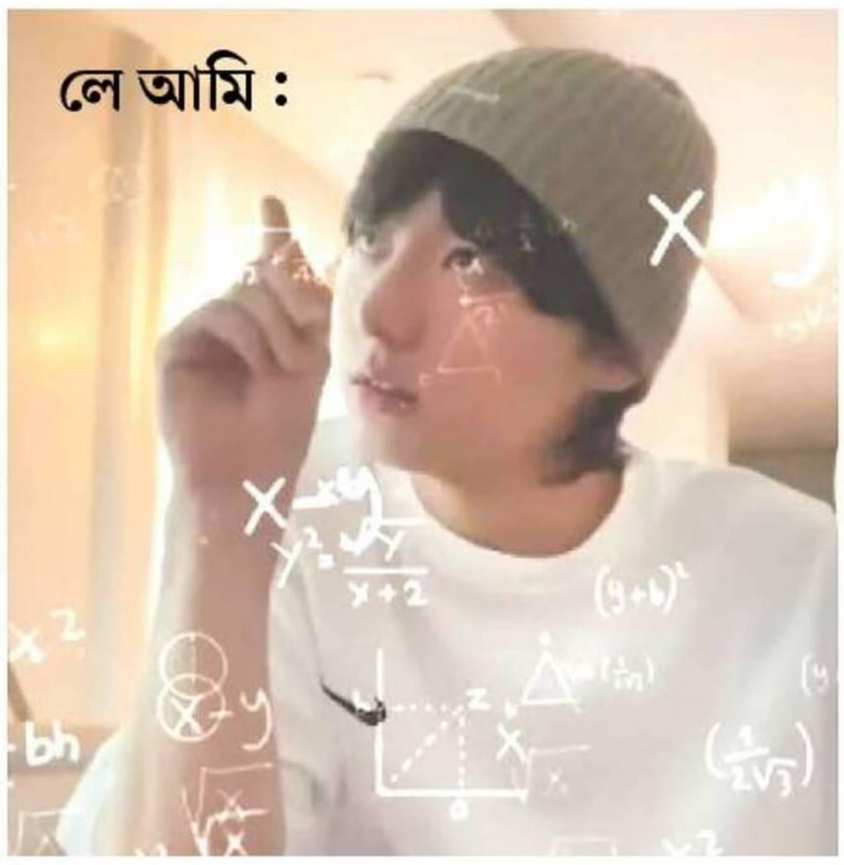
বিকেলে ঘুম থেকে উঠে যখন বুঝতে পারি না
সকাল না বিকাল, তখন আমি :



জান্নাতুল নাভিয়া
সপ্তম শ্রেণি, স্কুল অব লরিয়েটস ইন্টারন্যাশনাল, কুষ্টিয়া

তাজকিয়া তাহসিন
অষ্টম শ্রেণি, রহনপুর রাবেয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

স্যার যখন আমাকে ক্যালকুলেটর ছাড়া
অঙ্ক করতে বলেন।



জ্যাম থাকায় বাস থেকে নামার কিছুক্ষণ
পর যখন দেখি জ্যাম আর নেই



আহমেদ ইউশা
নবম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

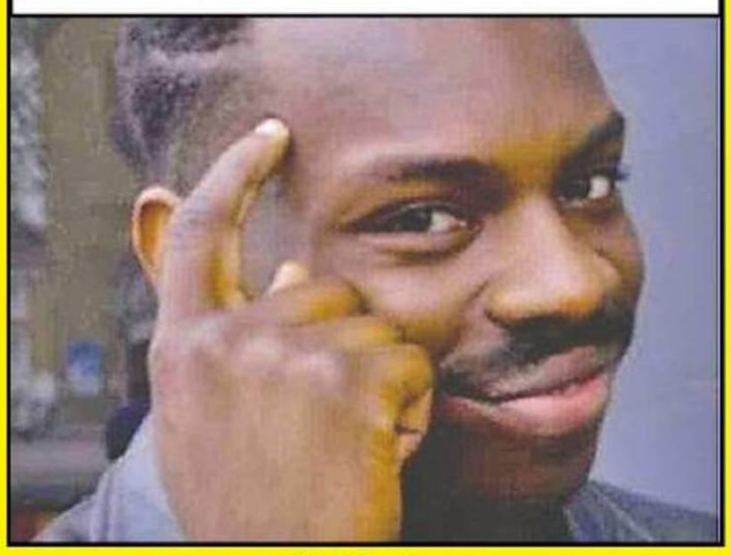
কিআ মিম কনটেস্ট ৮

সারা দিন তো মিম দেখেই কাটাও। এবার মিম বানিয়ে পাঠাও। নিচে আমরা একটা মিমের ছবি দিলাম। তোমরা ক্যাপশন লিখে পাঠাও। নিয়মটা খুব সহজ। কীভাবে পাঠাতে হবে, তা বিস্তারিত লেখা আছে নিচে।

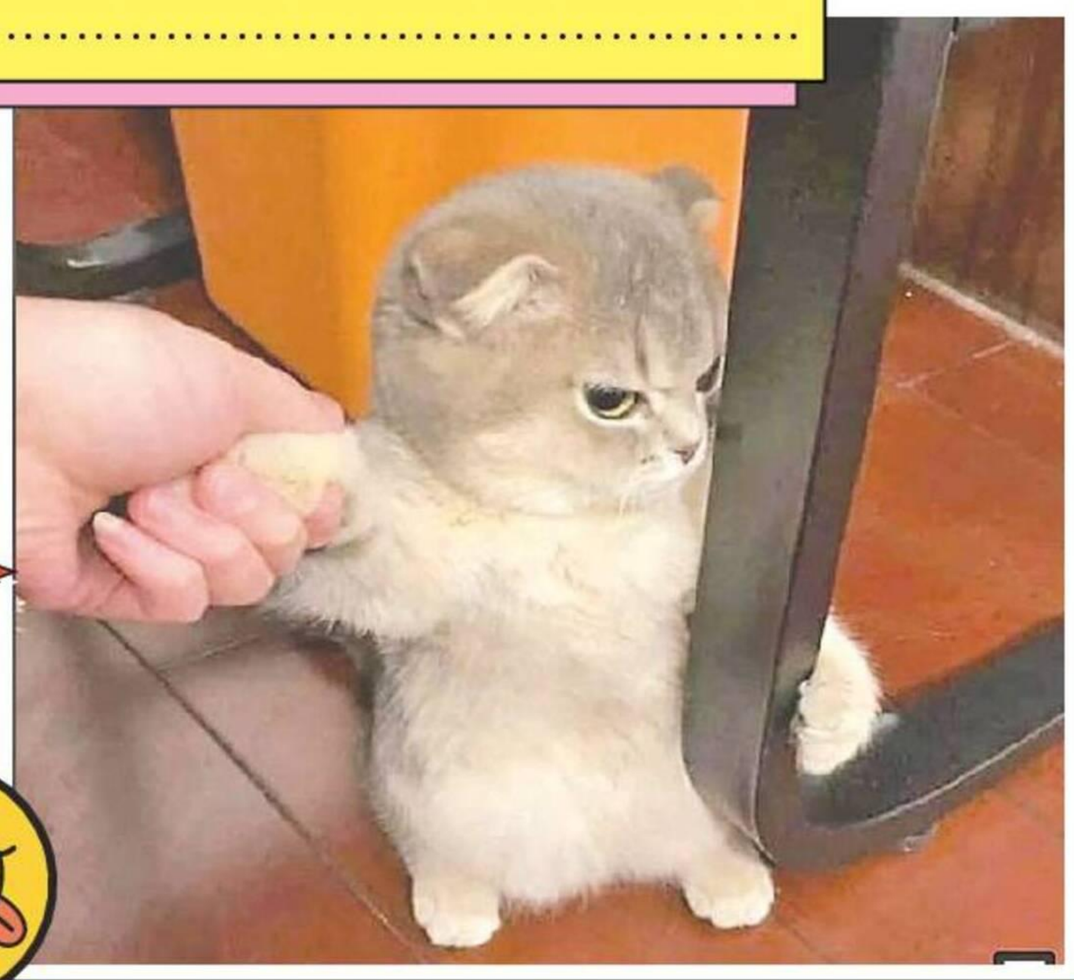
.....

মাবরুক রহমান
সপ্তম শ্রেণি, নোয়াখালী জিলা স্কুল, নোয়াখালী

টিভিতে বলল মোবাইল বেশি দেখা
নাকি মানুষের জন্য ক্ষতিকর
তাই বিক্রি করে দিয়েছি।



টিভিটা



নিয়মটা আগের মতোই। ওপরের ছবিটা ভালোভাবে দেখো। তারপর ফাঁকা বক্সে কী হবে, তা লিখে পাঠাও কিআর ই-মেইলে। বক্সে কী লেখা হবে, শুধু সেটাই লিখবে ই-মেইলের বডিতে। আর সাবজেক্টে লিখবে—'কিআ মিম কনটেস্ট ৮'। লেখার সঙ্গে তোমার নাম, ঠিকানা, মুঠোফোন নম্বর, স্কুলের নাম, শ্রেণি আর ঠিকানা অবশ্যই পাঠাবে। মিম পাঠানোর শেষ সময় **২০ সেপ্টেম্বর**। মিম কনেটেস্টের বাইরেও তোমরা নিজের বানানো মিম পাঠাতে পারো। সে ক্ষেত্রে ই-মেইলের সাবজেক্টে লিখবে—মিম।

তোমাদের পাঠানো সেরা মিমগুলো ছাপা হবে কিশোর আলোয়।

ধারাবাহিক কমিকস

রুচি

গল্প ও পেনসিল : **মেহেদী হক**
ইঙ্ক ও রং : **সব্যসাচী চাকমা**

জাদুশিলা রহস্য

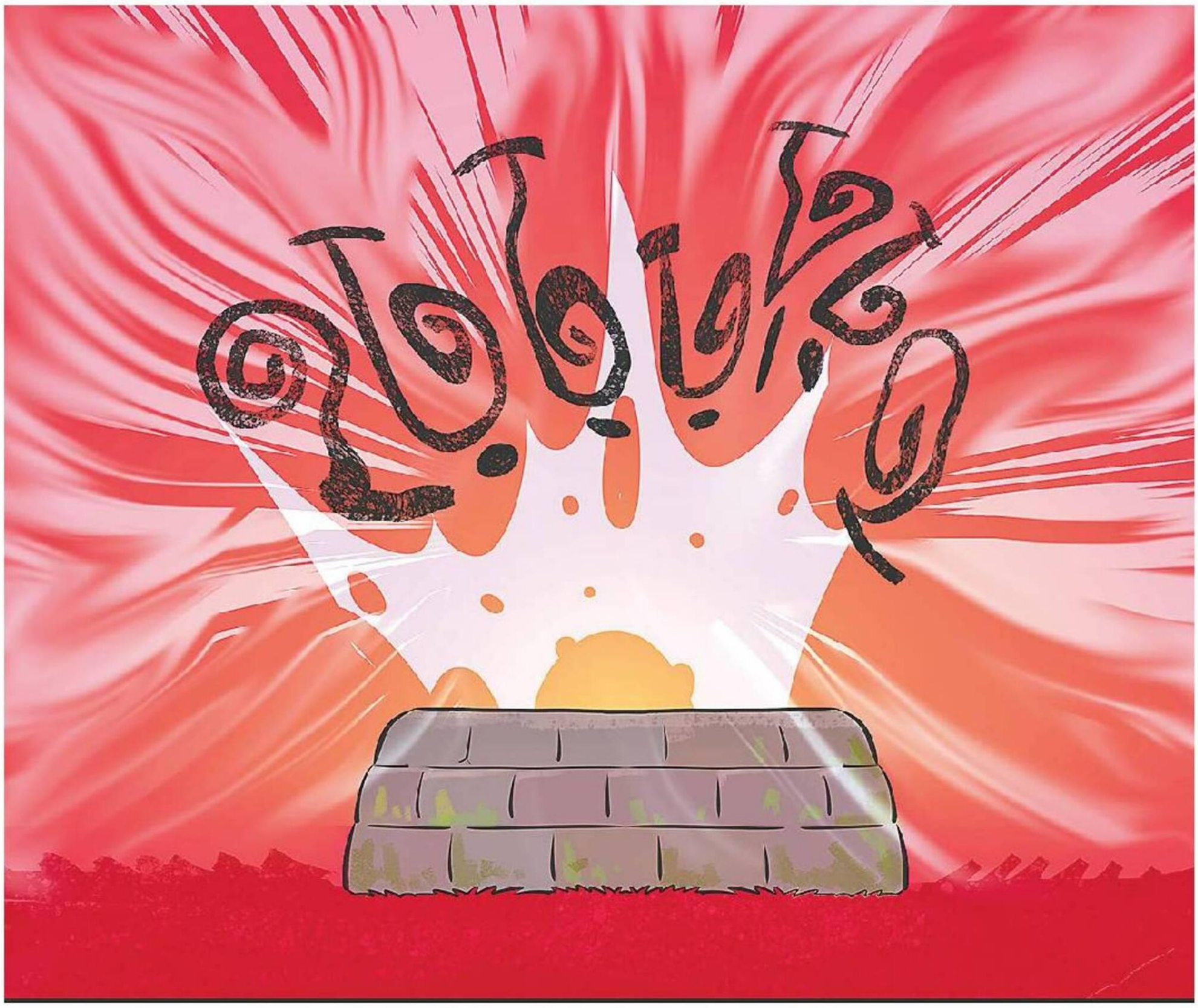
পর্ব : ১৪






এখন? এখন কী? মেয়েটার জ্ঞান ফিরবে? আমরা কী করব? জাদুশিলাও তো ধ্বংস হয়ে গেল!
কিছু করার নেই। ওকে 'কাল' নিজেই বাঁচাবে যদি প্রয়োজন মনে করে। তবে আমাদের এখনই ফিরতে হবে। নিজেদের সময়ে। আর কিছুই ধ্বংস হয়নি।
'কাল' বা সময় কিছুই ধ্বংস করে না। করে রূপান্তর। জাদুশিলা এখন এই মেয়েটার সাথে মিশে গেছে। চলো ফেরা যাক।
ফেরা যাক মানে? কীভাবে ফিরবে?
যেভাবে এসেছিলাম।
ভুলে গেছ? আমরা ইয়াতিরা জাদুশিলা ছাড়াই সময় পাড়ি দিতে পারি।
জলদি চলো। আমরা চেষ্টা করব গুরুকে হত্যা করার ঠিক আগে পৌঁছাতে এবং এবার আমরা দুজনে মিলে আজিনকে থামাব।


বাড়িয়ে নিন স্বাদ
রুচি
সস্ এবং কেচাপ
সবই মজা লাগে যে
স্কয়ার
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ

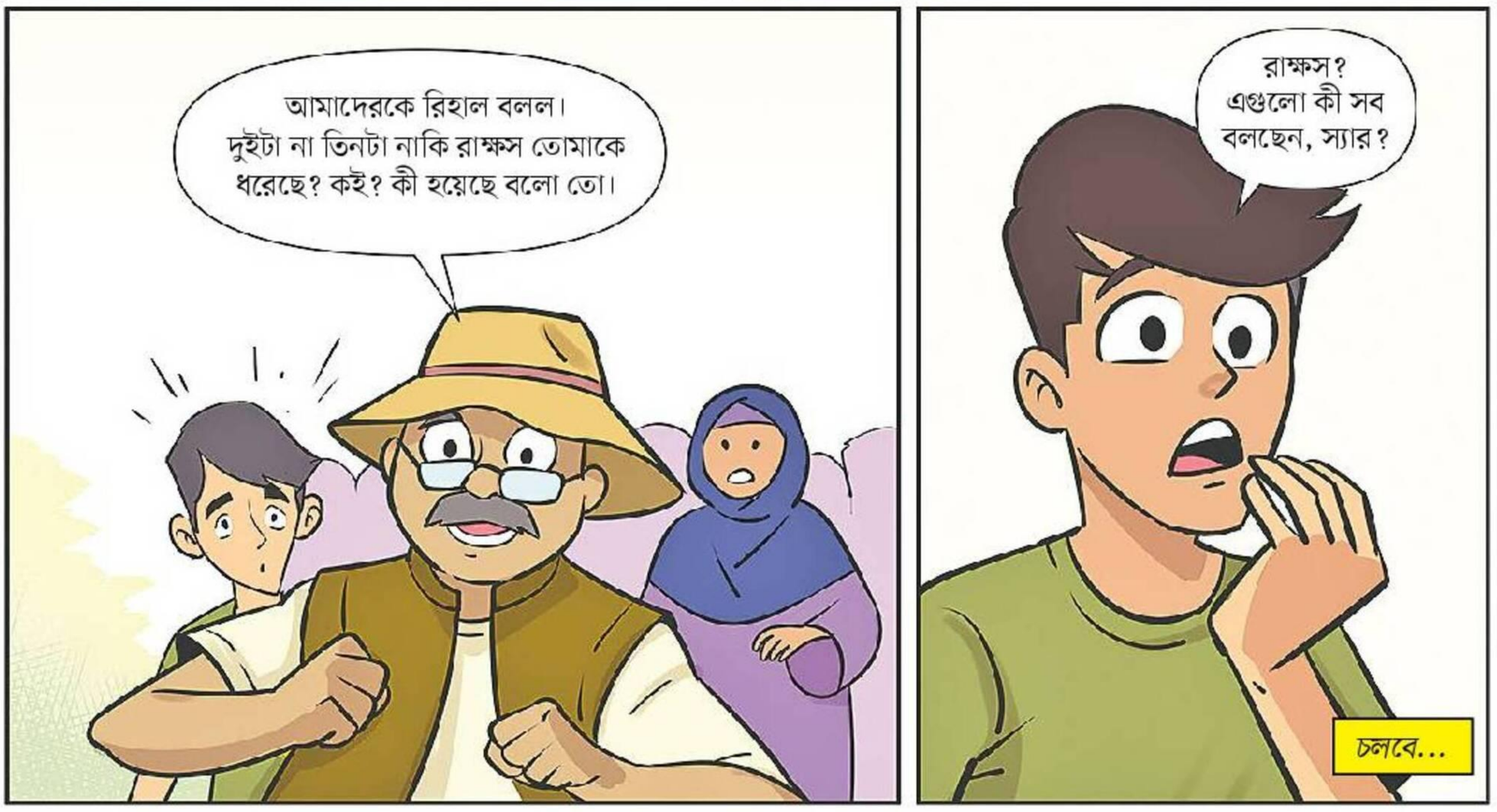

ঠকাঠক




কোন্‌টা ছেড়ে
কোন্‌টা খাবো?
রুচি
পটেটো ক্র্যাকার্স
স্কয়ার
ফুড এন্ড বেভারেজেস লিঃ




আআহ্।
কী হলো?
মাথাটা এমন
ধরে আছে কেন?
আমি কোথায়?
রিয়া!
তুমি ঠিক আছ?
কোথায় সেই রাক্ষস?
আমরা চলে এসেছি।
আর চিন্তা নেই।


আমাদেরকে রিহাল বলল।
দুইটা না তিনটা নাকি রাক্ষস তোমাকে
ধরেছে? কই? কী হয়েছে বলো তো।
রাক্ষস?
এগুলো কী সব
বলছেন, স্যার?
চলবে...


কিসের আওয়াজ?
নিশ্চয়ই কেউ ঝুরিভাজা খাচ্ছে!
ফ্রেয়ার
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ


রুচি
ঝুরিভাজা
রুচি ঝুরিভাজা
দারুণ কুড়মুড়ে! দারুণ মচমচে!

Reedisha
ILUBiLU
Wafer

অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু

পর্ব : ৫৬

লেখা : আদনান মুকিত
আঁকা : সব্যসাচী চাকমা



উত্তর দাও উপহার নাও

- **টুইটি কার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে?**
  ক. বাবা-মা খ. খালা-খালু
- **কলিংবেল কে চেপেছিল?**
  ক. ডেলিভারি বয় খ. কবজি কাটা মন্টু

সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ৩ জনকে দেওয়া হবে উপহার।
উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : **অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু**
রিদিশা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড, ৩৬ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২০৮। অথবা,
Email: badsha.rfbl@groupreedisha-bd.com

অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু - গত সংখ্যার বিজয়ী

মো. মিজবাহ উদ্দীন, দ্বাদশ শ্রেণি, কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার
আল বাশার বুনন, শ্রেণি, পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কেলজ, রংপুর
মেহজাবিন ফাইজা, ৮ম শ্রেণি, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ল্যাবরেটরি স্কুলঅ্যান্ডকলেজ, বগুড়া

* শর্ত প্রযোজ্য

Reedisha
ILUBiLU
Wafer



না, আমি তো এ রকম কিছু জানি না।

এতক্ষণ মাথা কাজ করছিল না, বাবার সাথে কথা বলে এখন ভালো লাগছে। মাত্র মনে পড়ল, বাবা আর দাদুকে কয়েক দিন ধরেই টেনশন করতে দেখেছি।

কী নিয়ে?

সেটা জানি না। আমি অত খেয়াল করিনি।

খালা কল করেছে।

হ্যাঁ খালা, কী অবস্থা দাদুর?

ইলু, যা তো, পিৎজা চলে এসেছে মনে হয়।

ডিং ডং!

আ-আ-পনি?

আ-আ-আপনি?

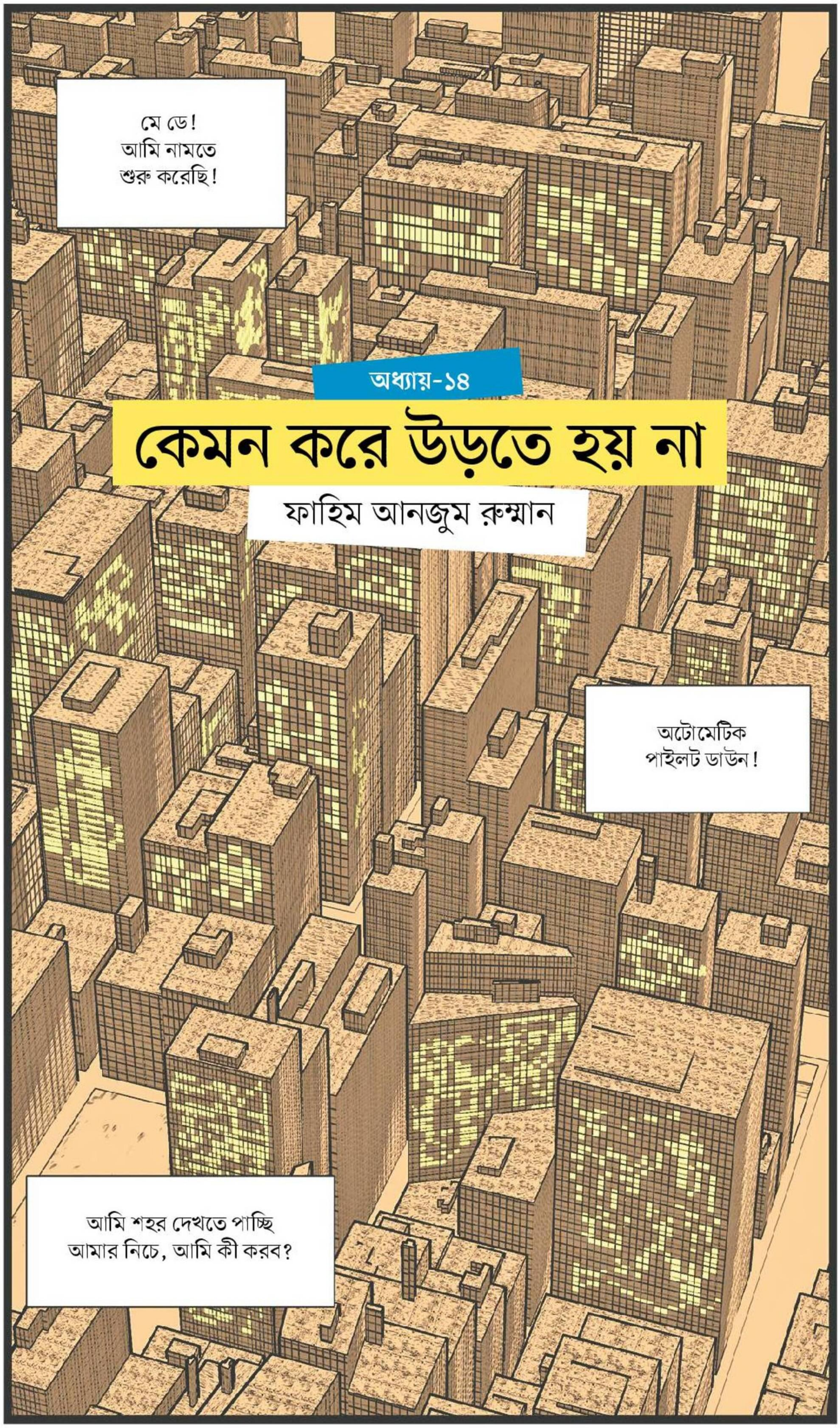
তুই কেডা? ওই মুরব্বিরে ডাক। আলাপ আছে।

আমি মন্টু।

কবজি কাটা মন্টু।

কবজি একটা শর্ট আছে।

চলবে


মে ডে!
আমি নামতে
শুরু করেছি!
অধ্যায়-১৪
কেমন করে উড়তে হয় না
ফাহিম আনজুম রুম্মান
অটোমেটিক
পাইলট ডাউন!
আমি শহর দেখতে পাচ্ছি
আমার নিচে, আমি কী করব?


ইগল ৩১,
তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?
নামার চেষ্টা
করো!


মে ডে,
মে ডে!
আমি কন্ট্রোল
হারিয়ে ফেলেছি,
হেলিকপ্টারের...
চলবে


আজকে জ্যামিতির ক্লাসে আমাদের বিষয় হলো গিয়ে বৃত্ত। আর বৃত্তের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই যেটি মাথায় আসে, সেটি হলো
বাসব রায়

জ্যামিতিক প্রমাণ


পিৎজা। ডবল-জিরো ময়দা দিয়ে কাঠের উনুনে বানানো, মোজারেলা চিজে মাখামাখি উপাদেয় এই পিৎজা।
সঙ্গে পাক্কা পাঁচটি টাটকা টপিংয়ের জাদু- অলিভ, টমেটো, মাশরুম, ক্যাপসিকাম উলুপস আর চিকেন।
এর ক্রাস্টটি ফিনফিনে, মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শনপাপড়ি- আহা!
আর এরই পাতলা ক্রাস্টে সেঁধিয়ে থাকে বৃত্তের সেন্টার, ডায়ামিটার, রেডিয়াস ইত্যাদি ইত্যাদি।
ব্যস, এই হলো গিয়ে বৃত্তান্ত। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে?
একটিই স্যার। আমরা কি এই বৃত্তের ডেলিভারি রেডিয়াসের মধ্যে পড়ি?
তা আজ জ্যামিতির ক্লাসে কী প্রমাণ হলো?
স্যার আর আমি আমরা দুজনই পিজ্জার বড় ভক্ত!

নাহে মামা

আঁকা ও লেখা : **সাবিত**




প্ল্যানে ফোকাস কর। এক দিনের জন্য নিজে একটু স্যাক্রিফাইস করতে পারবি না?
ডিবি স্যারের ক্লাস শেষে তন্ময় যাবি স্যারের সাথে। তোর টিউশন নিয়া কথা বলতে।


তারপর কি জিহাদ আর ক্যারা যাবে বাথরুমে মাহাবুব স্যারের বেত লুকাইতে?
ইয়েস বয়।
কিয়ের ইয়েস বয়! আমি লাগুর পামু না।


এ জন্যই তো জিহাদ যাবে তোর সাথে।
আর চাচা যদি আইসা পড়ে?
সমস্যা নাই, সায়মন আছে তো। ও ডিস্ট্র্যাক্ট করবে চাচারে।

যাই হোক। পরের ক্লাস মাহাবুব স্যারের। স্যারের ক্লাস ৩৭ মিনিটের। উনি ১০ মিনিটে সবার পড়া ধরা শেষ কইরা বাকি ২৭ মিনিট যারা পড়া পারে নাই, তাদেরসহ সবাইরে আটকায়া রাইখা ডলা দিবে।

শুধু হের লিগা টিফিন দেয় ১টা ৩৭ মিনিটে। ততক্ষণে বের হয়া দেখি রুহুল ভাইয়ের সব ফুচকা শেষ হয়া গেছে।

আচ্ছা, ৩৭ মিনিট কে ক্লাস নেয়?

হ্যাঁ, যেন আরও লেট হয় আর কালকে ডোরেমনের মুভিটা তোমার আব্বাকে বইলো আমাদের হইয়া দেইখা নিতে।

আঙ্কেল ডোরেমন দেখে? আমার আব্বাও যদি এমন হইতো রে।

হ্যাঁ, আমাদের এই বিষয়ে একটা উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কালকেই এটা নিয়ে স্যারদের সাথে কথা বলতে হবে।

তারপরে স্যারে নিজেই বেত আনতে যাবে। এখানেই জমবে খেলা। স্যার নিজের বেত বাদে কারওটা ইউজ করে না।

তারপর উনি বেত খুঁইজা পাবেন না, সেই কষ্টে ক্লাসে আইসা আমাদের ছুটি দিয়া দিবেন ২৭ মিনিট আগেই!

আর আমরা তাড়াতাড়ি বাসায় গিয়া ডোরেমনের নতুন মুভিটা দেখতে পারব।

এটা মাস্টারপ্ল্যান না, হেডমাস্টারপ্ল্যান!


সব মানলাম।
কিন্তু তুই প্ল্যান কইতে কইতে এডা কী আঁকাইলি?
হেহে গোকু!


তাইলে কালকের জন্য সব প্ল্যান সেট?
তোরা সব ঠিকঠাকমতো করলেই সেট।
আর তুই কী করবি?
আমি তো পুরা মাস্টারপ্ল্যানটা বানাইলাম।
পরদিন...

স্যার টিউশনের বেতন দিছে আম্মু

অহ আচ্ছা, আসো আসো। আমার বেতনের রসিদটা অফিস রুমে। একটু আসো আমার সাথে। আজকের মাইরে ব্যথা পাও নাই তো?

না স্যার, সমস্যা নাই।

সায়মন তুই চাচার দিকে নজর রাখিস।


হ। মাসের চালের বস্তা আমি কান্ধে কইরা উঠাই। তুই তো কিছুই না।
.....
পইড়া যামু না তো? পারবি?


আয়।
স্যার, আসতে পারি?



১০ মিনিট পর....

যারা যারা পড়া পারো নাই, তারা দাঁড়াও, আমি বেত নিয়ে আসতেছি।

আয়হায়, আমার বেত কই?

আজকে মনে হয় ওদের আগে আগে ছুটি দিতে হবে।

২ মিনিট- পর



কোন সংখ্যার মানে কী

আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা কিছু সংখ্যাকে শুভ বা সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করেন। আবার কিছু সংখ্যাকে ভাবেন অশুভ বা দুর্ভাগ্যের প্রতীক। কিন্তু কেন এমন হয়? এর পেছনে অনেক কারণ আছে। কেউ কেউ শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কোনো সংখ্যাকে শুভ বা অশুভ মনে করেন। আবার অনেকে সংখ্যাটির শব্দ বা দেখতে কেমন, তার ওপর নির্ভর করে সংখ্যাটিকে লাকি বা আনলাকি বলেন। এমন কিছু মজার সংখ্যা নিয়েই আজ জানব।



১৪

চীনে আবার ১৪ সংখ্যাটিকেও ‘মরতে চাই’ উচ্চারণের মতো শোনায়। তাই এই সংখ্যাও ওরা এড়িয়ে চলে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, দক্ষিণ আমেরিকায় এই একই সংখ্যাকে খুব সৌভাগ্যের প্রতীক ধরা হয়। কারণ, ১৪ মানে হলো দুইটা ৭-এর যোগফল। ৭ যেহেতু ওই দেশে সৌভাগ্যের প্রতীক, তাই ৭-এর দ্বিগুণকে তারা দ্বিগুণ লাকি সংখ্যা ভাবে।



১৭

ইতালির মানুষেরা ১৭ সংখ্যাটিকে একেবারেই পছন্দ করে না। ওদের দেশের অনেক উড়োজাহাজে ১৭ নম্বর সিট বা সারিই থাকে না! কারণটা খুব মজার। রোমানরা ১৭ সংখ্যাটিকে লিখত XVII। এটাকে যদি একটু ওলট-পালট করে সাজানো হয়, তাহলে হয় VIXI। আর ওদের ভাষায় এই VIXI কথাটার মানে হলো, ‘আমার জীবন শেষ!’ কী ভয়ের কথা, তা-ই না?



৪২

জাপানে গিয়ে ভুলেও জোরে ৪২ বলবে না! কারণ, জাপানি ভাষায় ৪ আর ২ একসঙ্গে উচ্চারণ করলে শোনায়, ‘মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি।’ এমন একটা কথা তুমি নিশ্চয়ই চিৎকার করে বলতে চাইবে না।



৪

চীন, জাপান আর কোরিয়ার মানুষ ৪ সংখ্যাটিকে খুব ভয় পায়। কারণ, ওদের ভাষায় ‘চার’ শব্দটা শুনতে অনেকটা ‘মৃত্যু’ শব্দের মতো। এ কারণে হংকংয়ের বড় বড় ভবনে ৪ তলা, ১৪ তলা, ২৪ তলা বা ৪ আছে, এমন কোনো তলা থাকে না। ভাবো তো, একটা ভবনের ৩ তলার পরই হয়তো ৫ তলা! ফলে একটা ৫০ তলা ভবন আসলে ৫০ তলা না-ও হতে পারে!



৭

৭ সংখ্যাটিকে প্রায় সব দেশেই শুভ মনে করা হয়। আয়ারল্যান্ডে বিশ্বাস আছে, যদি কোনো পরিবারে সপ্তম ছেলের সপ্তম ছেলে জন্মায়, তার নাকি জাদুকরি শক্তি থাকে। ইরানে আবার মনে করা হয়, বিড়ালের সাতটা জীবন থাকে। আর ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মে ৭ হলো পবিত্রতা ও পূর্ণতার প্রতীক।

মানুষ কেন সংখ্যাকে এভাবে বিচার করে

এখন মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে মানুষ কেন সংখ্যার মধ্যে মানে খুঁজতে যায়? সংখ্যার সঙ্গে ভালো বা মন্দের কী সম্পর্ক? আসলে অনেক আগে বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। তখন মানুষ অনেক কিছু বুঝত না। কেন অসুখ হয় বা কেন আবহাওয়া খারাপ হয়—এসবের কারণ তারা জানত না। তখন তারা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে মিল খোঁজার চেষ্টা করত। তারা হয়তো দেখত, কোনো একটা খারাপ ঘটনার সময় কোনো একটা সংখ্যা বারবার আসছে। তখন তারা সেই সংখ্যাকেই অশুভ বলে ধরে নিত। ঠিক একইভাবে, ভালো কিছু হলে কোনো সংখ্যাকে শুভ বলে মনে করত। এই শুভ সংখ্যাগুলো তাদের মনে আশা জাগাত। অনেকে ভাবত, সামনে ভালো কিছু হবে! এভাবেই যুগ যুগ ধরে সংখ্যার সঙ্গে নানা গল্প আর বিশ্বাস জড়িয়ে গেছে।



৮

চীনে ৮ হলো সবচেয়ে সৌভাগ্যের প্রতীক। এর মানে সমৃদ্ধি আর টাকা। তিনবার ৮ একসঙ্গে থাকা মানে টাকা আর সফলতা তিন গুণ বেড়ে যাওয়া। তাই ৮ লেখা গাড়ির নম্বর প্লেট বা বাড়ির ঠিকানা অনেক দামে বিক্রি হয়।











৬০

প্রাচীন ব্যাবিলনের মানুষেরা ৬০ সংখ্যাটিকে খুব ভালোবাসত। তাদের সব হিসাব-নিকাশ এই সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে হতো। আমরা এখন আর সেভাবে হিসাব করি না, কিন্তু তাদের সেই পদ্ধতির কিছু জিনিস এখনো রয়ে গেছে। যেমন প্রতি ঘণ্টায় ৬০ মিনিট আর প্রতি মিনিটে ৬০ সেকেন্ড।

হাউ টু বি আ ম্যাথ জিনিয়াস অবলম্বনে **কাজী আকাশ**

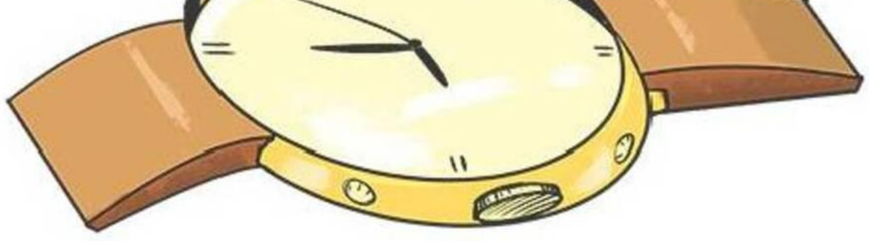


মাথা খাটাও

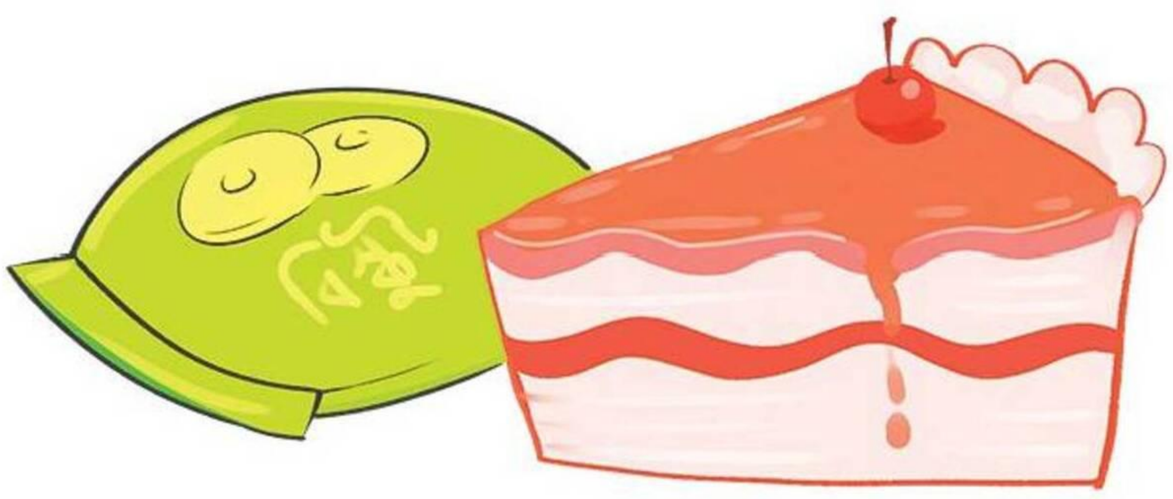
আড়ং ডেইরি
Milk for Good



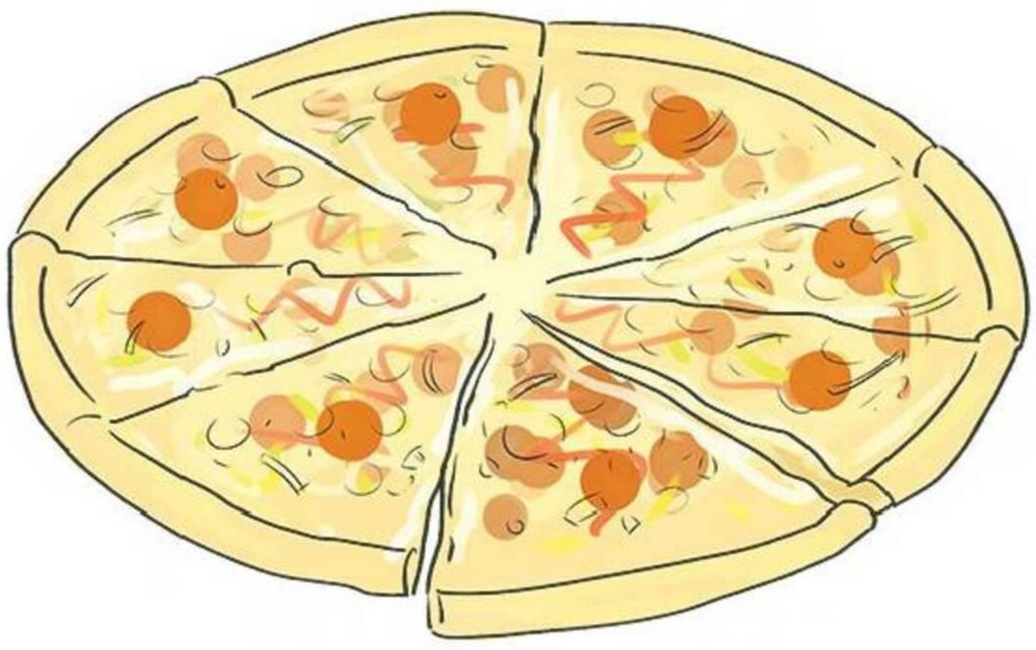
১. রনি রোজ বিকেলে মাঠে খেলতে যায়। সে ৩ : ৪০ মিনিটে খেলা শুরু করে এবং শেষ করে ৫ : ২০ মিনিটে। এই পুরো সময়ের অর্ধেক সময় সে ক্রিকেট খেলে, আর এক-চতুর্থাংশ সময় খেলে ফুটবল। বাকি সময়টা সে শুধু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। বলো তো, রনি কতক্ষণ আড্ডা দেয়?



২. ধরো, তোমার কাছে একটি আজব ঘড়ি আছে। ঘড়িটিতে এক ঘণ্টায় হয় ৪০ মিনিট, আর এক মিনিটে হয় ৪০ সেকেন্ড। তাহলে তিন ঘণ্টায় ওই আজব ঘড়িতে মোট কত সেকেন্ড হবে?



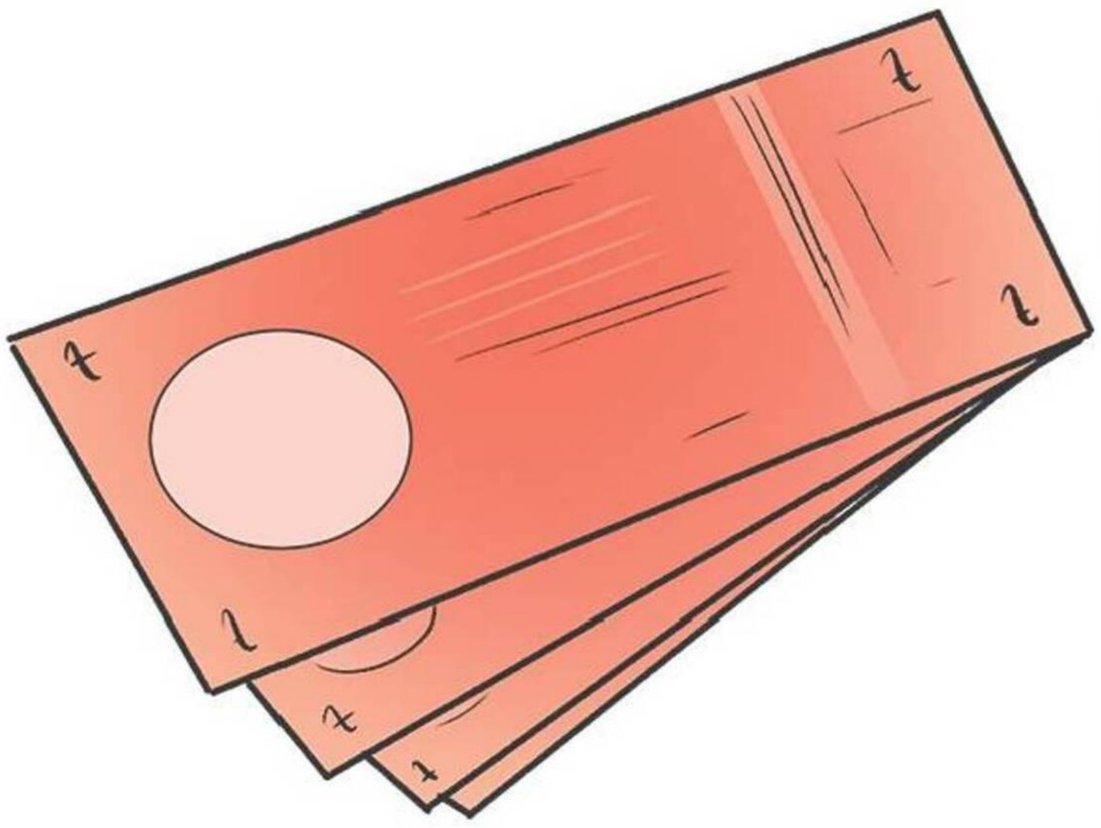
৩. রহমান খান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যানটিনে ৮০ প্যাকেট বিস্কুট ও ৬০ প্যাকেট কেক ছিল। স্কুল ছুটি হলে ৭২ জন শিশু দোকানে এল বিস্কুট বা কেক কিনতে। তাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ শিশু চাইল বিস্কুট, আর বাকি দুই-তৃতীয়াংশ চাইল কেক। এখন বলো তো, দোকানে সবার জন্য তাদের পছন্দের জিনিসটি কী ছিল?



৪. ছয় বন্ধু মিলে একটি পিৎজা ভাগ করে খেতে বসল। পিৎজাটিতে আটটি টুকরা করা ছিল। তারা সবাই সমান সমান ভাগে খেতে চায়। কিন্তু আটটি টুকরা ছয়জনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা যায় না। এখন বলো তো, তারা কীভাবে পিৎজাটিকে কাটলে সবাই সমান ভাগ পাবে এবং একটি টুকরাও বেশি থাকবে না?



গ্রন্থনা : **কিআ প্রতিবেদক**
অলংকরণ : সাফায়েত সাগর



৫. লীনা তার মায়ের কাছ থেকে ২৪০ টাকা পেয়েছে। এই টাকার এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে একটি খেলনা কিনল। খেলনা কেনার পর তার কাছে যে টাকা রইল, তার অর্ধেক খরচ করল বন্ধুদের নিয়ে। অবশেষে পকেটে যে টাকা ছিল, সেখান থেকে ২০ টাকা দিয়ে একটি চকলেট কিনল। বলো তো, এখন লীনার কাছে আর কত টাকা আছে?

মাথা খাটিয়ে বের করো গণিতের ধাঁধার উত্তরগুলো। তারপর নিচের কুপনটা পূরণ করে পাঠিয়ে দাও কিশোর আলোর ঠিকানায়। খামের ওপর অবশ্যই লিখবে : গণিতের ধাঁধা, কিশোর আলো। সেরা তিনজন বিজয়ীর জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। কুপনটি পাঠাতে হবে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। চাইলে কিআর ই-মেইলেও উত্তর পাঠাতে পারো। তাহলে আজই বসে পড়ো গণিতের ধাঁধার সমাধানে।

গতবারের সমাধান

১. ঘড়িটি প্রতি ঘণ্টায় ৫ মিনিট দ্রুত চলে। আজ সকাল ৭টা থেকে আগামীকাল সকাল ৭টা পর্যন্ত মোট ২৪ ঘণ্টা। ২৪ ঘণ্টায় ঘড়িটি দ্রুত চলবে ২৪ × ৫ = ১২০ মিনিট। ১২০ মিনিট = ২ ঘণ্টা। অর্থাৎ, আগামীকাল সকাল ৭টায় ঘড়িটি ৭টা + ২ ঘণ্টা = ৯টা দেখাবে।

২. মোট ৬৪টি টুকরা চকলেট আছে। প্রতিবার ভাঙলে টুকরার সংখ্যা ১টি করে বাড়ে। তাহলে মোট ৬৪টি টুকরা পেতে হলে, ৬৪ − ১ = ৬৩ বার ভাঙতে হবে।

৩. সংখ্যাগুলো হলো ১, ২ ও ৩।

৪. দশ টাকার নোট ১২টি এবং বিশ টাকার নোট ৯টি।

৫. খামারে ১২টি খরগোশ এবং ২৩টি মুরগি আছে।

গ্রন্থনা : **কিআ প্রতিবেদক**

গণিতের ধাঁধা ৭৪-এর বিজয়ী

- **উনজিলা ইউহা**
  মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা
- **স্পর্শ মজুমদার**
  রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার
- **আরিশ মোহাম্মদ সানিয়ান**
  পাইকগাছা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, খুলনা

‘গণিতের ধাঁধা ৭৫’-এর উত্তর পাঠাও

নাম .....

বয়স ..... শ্রেণি..... ফোন .....

স্কুল-কলেজ .....

ঠিকানা .....

.....

এখানে কাটো

পাঠাবে এই ঠিকানায়

গণিতের ধাঁধা

কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ই-মেইল : **editor@kishoralo.com**

আড়ং ডেইরি
Milk for Good



এভারেস্টজয়, গণিত আর রক গানের কিআড্ডা

বেলা তিনটা বাজতেই শুরু হয় এবারের কিআড্ডা। শুরুতে কিশোর আলোর আড্ডায় আসেন কিআ সম্পাদক আনিসুল হক। সদ্য তিনি আলাস্কা ভ্রমণ করে ফিরেছেন। আড্ডায় কিশোর আলোর পাঠকদের সঙ্গে ভাগাভাগি করলেন সেই গল্প। সাত রাতের ক্রুজ ভ্রমণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভালোবাসা পেয়েছেন। জানালেন আরও কিছু মজার অভিজ্ঞতা।

অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি উপন্যাস নিয়ে পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দেন কিশোর আলোর সহযোগী সম্পাদক আদনান মুকিত। সেই গল্পে যোগ দেন কিশোর আলোর প্রদায়ক সরদার আকিব লতিফ। দুই বছর পর দেশে ফিরে পাঠকদের জাপান নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেন, নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

এরপর আড্ডায় যোগ দেন গণিত শেখার প্ল্যাটফর্ম বাংলার ম্যাথের দুজন সহপ্রতিষ্ঠাতা। ছিলেন আহমেদ শাহরিয়ার শুভ ও মাহতাব হোসাইন। শিশুদের গণিতের ভয়ের কারণ বের করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়ানোর কথা বলেন তাঁরা। গণিতকে সহজ ও আনন্দময় করার জন্য নিজেদের উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত জানান তাঁরা। তাঁরা কথা বলেন গণিত অলিম্পিয়াড নিয়ে। বাংলার ম্যাথের পরবর্তী আয়োজনে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে বলে জানান তাঁরা।

এরপর আড্ডায় যোগ দেন 'সি টু সামিট'খ্যাত এভারেস্টজয়ী ইকরামুল হাসান শাকিল। যিনি কক্সবাজার থেকে হেঁটে জয় করেছেন এভারেস্টচূড়া। তাঁর এভারেস্ট জয়ের অভিজ্ঞতা বিস্তারিত জানান তিনি। এ ছাড়া তিনি পাঠকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।

পরের পর্বে রক ব্যান্ড 'রকসল্ট' যোগ দেয় কিআড্ডায়। গান নিয়ে রিয়েলিটি শো 'দ্য কেইজ'-এর প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন ব্যান্ড রকসল্ট। প্রথমেই এ ব্যান্ডের সদস্যরা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন। একে একে রিয়েলিটি শো থেকে শুরু করে ব্যান্ড কেমন করে গঠিত হলো, জানান তাঁরা। গেয়ে শোনান তাঁদের সম্প্রতি রিলিজ পাওয়া গান 'নিষ্পত্তি'। জানান গানটির পেছনের গল্প। আড্ডার ফাঁকে পরের মাসে রিলিজ পেতে চলা 'অগ্নিবীণা' গানটি গেয়ে শোনান তাঁরা। এ মাসের কিআড্ডার সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন জাহিন যাঈমাহ্ কবির ও কিআর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের। গান-আড্ডা শেষে চিপস খেতে খেতে শেষ হয় এ মাসের অফলাইন কিআড্ডা।

কিআ প্রতিবেদক, ছবি : আব্দুল ইলা

গল্পধাঁধার অনলাইন আড্ডা

অনলাইনে এবারের আড্ডাটা হয়েছে একদম সংক্ষেপে। মাত্র ৪০ মিনিটে মিটিং শেষ। শুরুটা হয়েছে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে। সব অনলাইন মিটিংয়ে যেমন হয়, তুমি কেমন আছ? ভালো আছি বলতে না বলতে আরেকজন জিজ্ঞেস করে, আপনি কেমন আছেন? এভাবে শুরু হলেও কিশোর আলোর পাঠকদের একের পর এক মন্তব্যে সভা জমে ওঠে। এরপর সভায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানান কিশোর আলোর সহযোগী সম্পাদক আদনান মুকিত। একজন পাঠক জানায়, আদনান মুকিত জুলাই সংখ্যায় গল্প লিখেছেন, এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। এরপর কিশোর আলোর এ মাসের সভার অতিথি লেখক মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ যোগ দেন। তিনি কিশোর আলোয় গল্পধাঁধা বিভাগটিতে লেখেন। এ বিভাগে ছাপা হয় একটি গল্প, যেখানে একটি ধাঁধা বা রহস্য থাকে। এ রহস্যের সমাধান পরের সংখ্যায় ছাপা হয়। গল্পধাঁধা বিভাগটি নিয়মিত ছাপানোর জন্য এক পাঠক অনুরোধ করে। আরেক পাঠক অতিথিকে প্রশ্ন করে, কীভাবে গল্পধাঁধা লেখার আইডিয়া তিনি পান? লেখক বলেন, 'চারপাশ থেকে। যেমন তোমাদের মন্তব্য থেকেও আইডিয়া পাওয়া সম্ভব।'

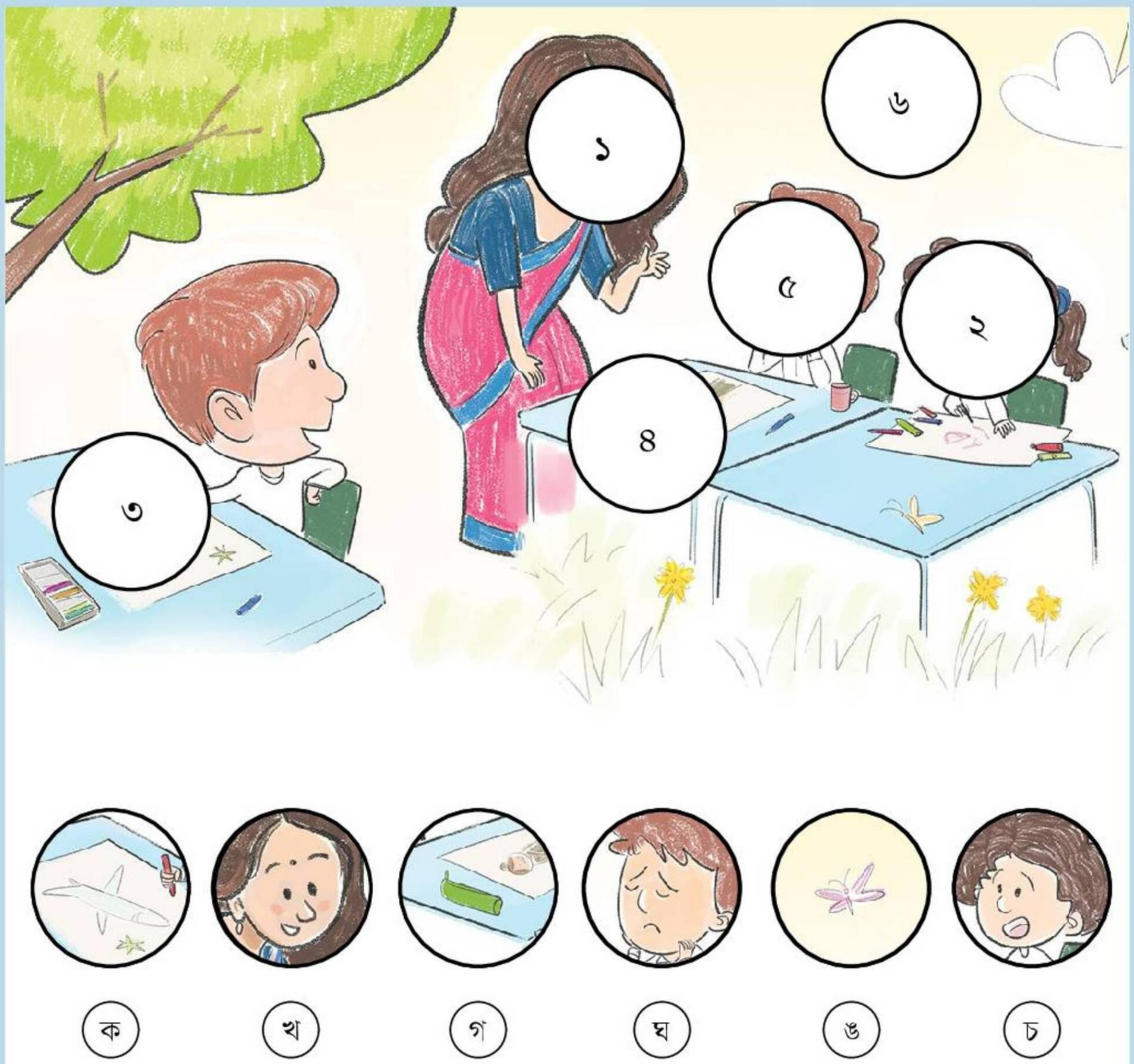
এরপর সভায় যোগ দেন কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হক। তাঁকে পেয়ে পাঠকের প্রশ্ন ছিল, 'মাইক্রোবাস ভূতে চালাচ্ছিল' গল্পটি কি সত্যি? আনিসুল হক উদাহরণ দিয়ে বলেন, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে যুক্তরাষ্ট্রে এক লেখক পরামর্শ দিয়েছিলেন, তোমার গল্পে সত্যি বলে গল্পটা নষ্ট কোরো না। গল্পে কিছু সত্যির সঙ্গে কিছু বানিয়ে গল্প যোগ করলেই সেটা গল্প হয়ে উঠবে।

আগস্ট মাসের কিশোর আলোর অনলাইন সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কিশোর আলোর নিয়মিত লেখক আসহাবিল ইয়ামিন, কিশোর আলোর ইভেন্ট বিভাগের নওশিন শারমীন, ভিডিও বিভাগের আব্দুল ইলা। সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন কিশোর আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের।

কিআ প্রতিবেদক

টুকরো মেলাও ৪৮

নিচের অলংকরণটির যে অংশগুলো নেই, সেগুলো মেলানোর চেষ্টা করো।



কাকুরো ৪৮

এখানে সাদা খালি অংশে তোমাকে এমন অঙ্ক বসাতে হবে, যেগুলোর লম্বালম্বি কিংবা পাশাপাশি যোগফল হবে ধূসর ঘরে থাকা সংখ্যার সমান। এ ক্ষেত্রে ধূসর ঘরের দাগের ওপরে সংখ্যা থাকলে তা হবে ডানের অঙ্কগুলোর যোগফল। আবার ধূসর ঘরের দাগের নিচে সংখ্যা থাকলে তা হবে নিচের অঙ্কগুলোর যোগফল। লম্বালম্বি কিংবা পাশাপাশি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একবারই বসানো যাবে।

			২৩	৪
		১২ / ২৪		
	১৪ / ৩			
১৯				
৯				

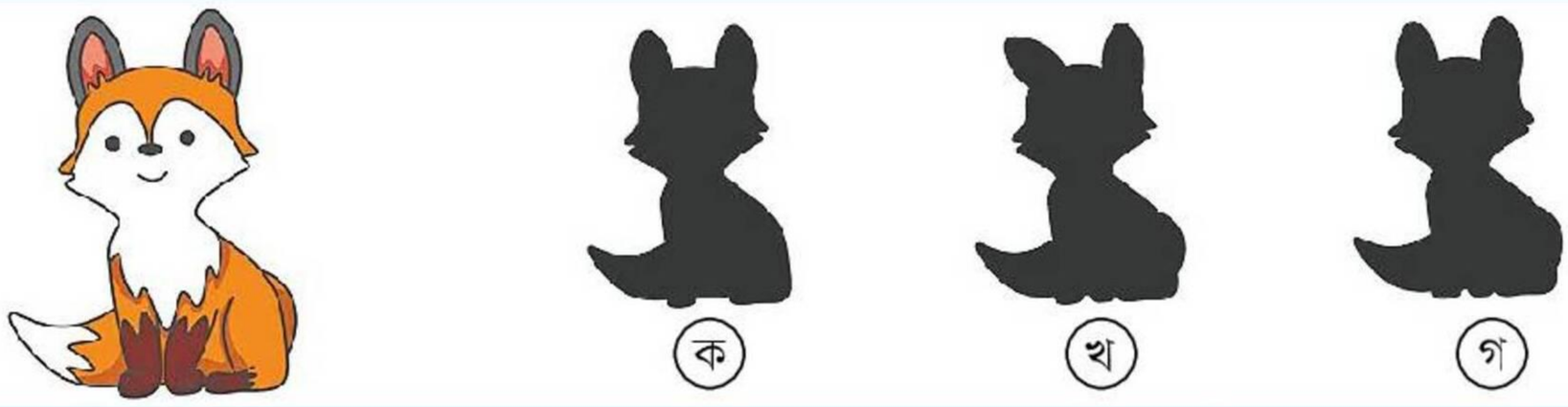
কে ভিন্ন ৪৮

চারটি যন্ত্রের ছবি দেওয়া আছে এখানে। বলো তো, এগুলোর মধ্যে কোনটি ভিন্ন এবং কেন?



ছায়াছবির ছায়া চেনা ৪৮

নিচের ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ করো। পাশের কোন ছায়াটি ছবির সঙ্গে মেলে?



খেলাধুলা জিজ্ঞাসা ৬৯

১. **বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নতুন সভাপতি কে?**
ক. হাবিবুল বাশার
খ. আকরাম খান
গ. আমিনুল ইসলাম বুলবুল

২. **ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত দ্য হানড্রেড টুর্নামেন্টে কোন দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে?**
ক. ওভাল ইনভিন্সিবলস
খ. ট্রেন্ট রকেটস
গ. নর্দার্ন সুপারচার্জারস

৩. **১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকসে দেশের দ্রুততম মানবী হয়েছেন কে?**
ক. শিরিন আক্তার
খ. সুমাইয়া দেওয়ান
গ. শরিফা খাতুন

খেলাধুলা জিজ্ঞাসা ৬৮-এর উত্তর

১. খ. ইয়ানিক সিনার
২. ক. জাকের আলী
৩. খ. ইংল্যান্ড



ছায়াছবির ছায়া চেনা ৪৭-এর উত্তর



কে ভিন্ন ৪৭-এর উত্তর



সুডোকু ৭৯

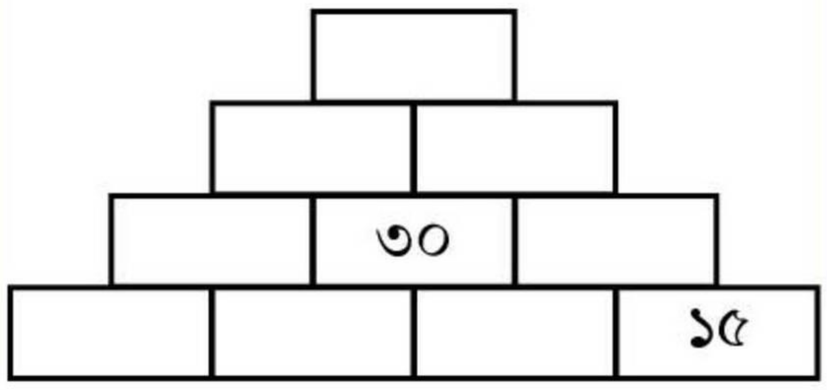
	১	৪			৮		৯	
	৭				৬	৫		
৯		৫			১	২	৩	
		৬	১			৪		
১	৮					৩		৫
			৮					
	৫				২			৩
	৩		৬	১	৫		২	
		১			৪		৫	৬

নিয়মাবলি

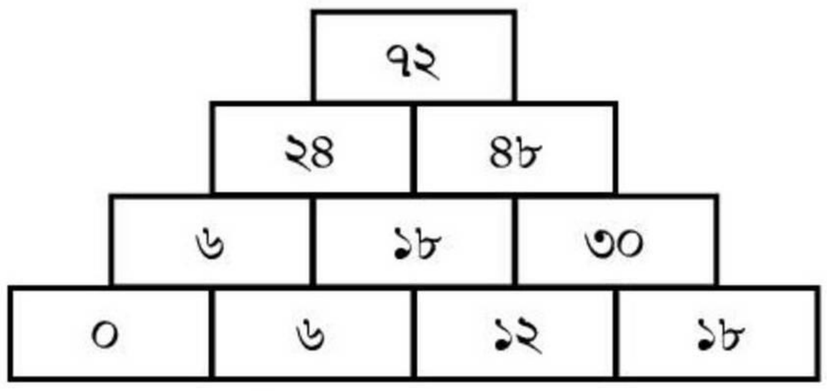
ছকটি খাতায় এঁকে খালি ঘরে সংখ্যাগুলো বসিয়ে পাঠাও।

সংখ্যার পিরামিড ৪৮

ফাঁকা ঘরে এমনভাবে সংখ্যা বসাও যেন নিচের দুই ছকে থাকা সংখ্যার যোগফল হয় ওপরের সংখ্যা।



সংখ্যার পিরামিড ৪৭-এর উত্তর



কাকুরো ৪৭-এর উত্তর

			২৪	৭
	২৪	১৩ ৭	৯	৪
২১	৭	৪	৮	২
১৯	৯	২	৭	১
৯	৮	১		

কুইজের উত্তর পাঠাও

কুইজের উত্তর চাইলে সব একসঙ্গে পাঠাতে পারো। অথবা তুমি যেগুলোর উত্তর পারো, সেগুলো আলাদা করে আলাদা কাগজেও লিখে পাঠাতে পারো। আগে কাগজে বড় করে কুইজের নাম লিখে পরে উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা, মুঠোফোন নম্বর লিখতে হবে। এই কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠাতে হবে তোমার লেখা উত্তরের সঙ্গে। কুপনের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। খামের ওপর প্রথমে বড় করে লিখতে হবে 'কুইজ', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে কুইজ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবে রকমারি.com-এর সৌজন্যে ২০০ টাকার বই। কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ **২০ সেপ্টেম্বর**। ই-মেইলে পাঠানো উত্তর গ্রহণযোগ্য নয়।

নাম .....

শ্রেণি.....

ফোন .....

স্কুল-কলেজ .....

.....

পূর্ণ ঠিকানা .....

.....

.....

.....

এখানে কাটো

পাঠাবে এই ঠিকানায়

কুইজ

কিশোর আলো

১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

সুডোকু ৭৮-এর উত্তর

৪	১	৯	৬	৮	৩	২	৭	৫
৫	৭	২	৪	৯	১	৮	৬	৩
৩	৬	৮	৫	৭	২	৪	১	৯
৯	৪	৫	৩	২	৭	৬	৮	১
২	৩	৭	৮	১	৬	৫	৯	৪
৬	৮	১	৯	৪	৫	৭	৩	২
৮	২	৪	৭	৩	৯	১	৫	৬
১	৫	৩	২	৬	৮	৯	৪	৭
৭	৯	৬	১	৫	৪	৩	২	৮

কিআ কিশোর আলো

আগস্ট সংখ্যার

কুইজ বিজয়ী

তোমাদের পাঠানো অনেক উত্তরের মধ্য থেকে লটারিতে এই ২৪ জনের নাম উঠে এসেছে। তোমরা প্রত্যেকে পাবে রকমারি.com-এর সৌজন্যে ২০০ টাকার বই।

টুকরো মেলাও

- **তাওয়াব মস্তফা**, কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নাটোর
- **আল মুজতাহীদ হাসান**, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
- **ফারিকা ফেরদৌসী**, বিসিএসআইআর উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

কাকুরো

- **সৌগত সরকার**, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী
- **মাশরুবা রাজ্জাক**, নূরজাহানপুর (অব.) সামরিক কলোনি উচ্চবিদ্যালয়, দিনাজপুর
- **আহনাফ ইসলাম**, কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নাটোর

কে ভিন্ন

- **অভীক হাসান**, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **এলিনা জামান**, বিএইচ খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **নোভা**, রাজধানী উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

ছায়াছবির ছায়া চেনা

- **রাইনা হোসেন**, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **মো. বায়জীদ হোসেন**, খাতুনে জান্নাত ক্যাডেট মাদ্রাসা, রংপুর
- **মুনতাহা ফাইজা**, মানির আহমদ একাডেমি ক্যাডেট কলেজ, সিলেট

খেলাধুলার জিজ্ঞাসা

- **তাওফি হেজাজি**, শাহীন স্কুল, কুষ্টিয়া
- **লাবনী**, হাসানিয়া উচ্চবিদ্যালয়, গাজীপুর
- **রাহমা মনি**, প্রতিভা শিশু বিকাশ স্কুল, ময়মনসিংহ

সুডোকু

- **জারিফ বিন জাফর**, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **এম তামজীদ হোসাইন**, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **নাবিহা ইসলাম**, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সংখ্যার পিরামিড

- **মুহাম্মদ মুস্তাবীন শরীফ**, বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম
- **মো. মাহসান মোর্শেদ**, বরগুনা জিলা স্কুল, বরগুনা
- **উদর্প সাহা**, সেন্ট জোসেফ উচ্চবিদ্যালয়, খুলনা

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে

- **আরিশা রহমান**, নৌ পরিবার শিশুনিকেতন, খুলনা
- **জুইফুর রহমান**, ভোলা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ভোলা
- **দৃশ্য দাস**, সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা

গত সংখ্যার উত্তর

টুকরো মেলাও ৪৮-এর উত্তর :

১. চ	২. খ
৩. ঘ	৪. ঙ
৫. গ	৬. ক

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে ১২৪-এর উত্তর :

১. মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল
২. দোতলায়
৩. ১০-১২ বছর

১২৫

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে পাঠাও।

১. জর্জি হ্যারিসকে মেডিকেল স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয় কেন?
২. আগাথা ক্রিস্টির সন্ধানে কতজন স্বেচ্ছাসেবক নেমে পড়েন?
৩. চীনে ১৪ সংখ্যাটির উচ্চারণ কেমন?



কিশোর আলোর
গ্রাহক হও

৬০০ টাকা দিয়ে এক বছরের এবং ৩০০ টাকা দিয়ে ছয় মাসের গ্রাহক হলে কোনো ডেলিভারি চার্জ ছাড়াই ঘরে বসে পেয়ে যাবে কিশোর আলোর পরবর্তী সংখ্যাগুলো।

গ্রাহক হতে ভিজিট করো
https://subscription.palobd.com

অথবা কল করো ০৯৬৬৬-৭০১০৭০ নম্বরে
(ছুটির দিন ছাড়া যেকোনো দিন
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)

কিআ কিশোর আলো

Reedisha™

ILUBILU

Wafer

মিল্ক, স্ট্রবেরী, চকলেট ও বাবল গাম

মজাদার চারটি ভিন্ন স্বাদে
রিদিশা ইলুবিলু ওয়েফার
এখন আপনার হাতের কাছে ...



প্রতি প্যাকেটে থাকছে
আকর্ষণীয় স্টিকার



Reedisha™
সবার স্বাদ বোঝে ...



মমতায় বাড়াই সম্পর্কের গভীরতা

৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্কগুলোকে মমতায় ঘিরে রেখেছে তীর।
তাইতো সরিষার তেল থেকে শুরু করে রেডি মিক্স পর্যন্ত সবকিছুতেই
বিশুদ্ধতার প্রশ্নে কখনোই আপস করেনি তীর।

ভিডিওটি দেখতে স্ক্যান করুন

www.citygroup.com.bd /TEER1972